আবু রুশ্‌দ

আওয়ামী লীগ ও সশস্ত্রবাহিনী

আবু রুশ্‌দ

তাসনিয়া বই বিতান

উৎসর্গ

মরহুম ব্রিগেডিয়ার শাবাব আশফাক
-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে

সূচীপত্র

১। আওয়ামী লীগ ও সশস্ত্র বাহিনী..৮
ক। সশস্ত্রবাহিনীর রাজনীতিকীকরণ ও দলীয়করণ প্রসঙ্গ.....................১২
খ। সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন প্রসঙ্গে... ১৩
গ। সামরিক অভ্যুত্থান ও সশস্ত্রবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি.........................১৮
২। প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পয়ঃপ্রণালী- সেনাবাহিনীর বিকল্প কর্মসংস্থান.....২৬
৩। সর্বাধুনিক সশস্ত্রবাহিনী গঠনের ফানুস...২৮
৪। জেনারেল নাসিমের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নেপথ্য কাহিনী.........................৩২
৫। সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগে গভীর হতাশা............. ৩৫
৬। সেনাবাহিনীতে ভারতীয় অশোক লেল্যান্ড ট্রাক সংগ্রহের পাঁয়তারা..........৩৮
৭। গোয়েন্দা সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে রক্ষীবাহিনী ও আত্মীয়কর্মকর্তা নিয়োগ...৪১
৮। সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতের অপপ্রচার....৪২
৯। সেনাবাহিনী প্রধানের পদেও কি আত্মীয়করণ করা হচ্ছে?...................৪৫
১০। জেনারেল (অব.) নাসিম সেনাবাহিনী পরিচালনা করছেন?.................৪৬
১১। সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ঐতিহ্য ও আইন প্রশ্নের সম্মুখীন.....................৪৯
১২।আ'লীগ বুদ্ধিজীবীদের সেনাবাহিনী বিরোধী প্রচারনা..........................৫০
ক.আপনার পরিচয়? সেনাবাহিনী তোয়াজ পার্টি মুনতাসীর মামুন.............৫০
খ.সামরিক বাজেট...৫২
গ.শেখ মুজিব জেনারেল সফিউল্লাহকে বলেছিলেন, আমার সশস্ত্র বাহিনীর কোনো প্রয়োজন নেই...৫৩
ঘ.বরিশালে যুবলীগের সম্পাদক পিটিয়েছে সেনা কর্মকর্তা.....................৫৩
১৩। The Frigate Behemoth.. ৫৪
১৪। মেয়াদশেষের আগেই ফ্রিগেট সংগ্রহে সরকারের তৎপরতা..................৫৬
১৫। মিগ-২৯ এখন শুধুই কি শো পিস?..৫৯
ক.বাংলাদেশের অর্ধেক দামে কিনেছে বার্মা..৬১
মিগ-২৯ কেলেঙ্কারির কেচ্ছা
গ.সাড়ে ৩শ' কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার........৬২
১৬।বিমান বাহিনীর স্পেশাল ফ্লাইং ইউনিটে এত পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?......৬৩
১৭।ক. সি-১৩০ বিমান সংগ্রহ প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ............................৬৪
খ মিগ-২৯-এর পর অর্ধশতাব্দীর পুরানা সি-১৩০ বি বিমানের নামে আরেক শ্বেতহস্তী ঢুকছে বিমান বহরে..৬৫

১৮। এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল উদ্দিন বাইপাস
সার্জারী করেও তথ্য গোপন করেছেন..৬৭
১৯। বিমান বাহিনীর আকাশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা
হুমকির সম্মুখীন..৭০
২০। সামরিক বাহিনীতে হতাশাঃ কারণ কি?..৭১
২১। জে. মুস্তাফিজ এলপিআর-এ থেকেও আ'লীগের
পক্ষে প্রকাশ্যে রাজনীতি করছেন, কিন্তু কিভাবে?..........................৭৪
২২। আওয়ামী লীগ শাসনামলে ডিজিএফআই-১.................................৭৭
২৩ ।আওয়ামী লীগ শাসনামলে ডিজিএফআই-২.................................৭৮
২৪ ।আওয়ামী লীগ শাসনামলে ডিজিএফআই-৩.................................৮০
২৫। যে কারণে 'স্বেচ্ছা অবসরে' গেলেন
মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান, বীর বিক্রম.................................৮১
২৬। সন্ত্রাসের কালো থাবা থেকে সেনা কর্মকর্তারাও নিরাপদ নন............৮৫
২৭। রাজনৈতিক সংকট নিরসনে অনাগ্রহের অপবাদ বিরোধী দলের ঘাড়ে
চাপানোর কৌশল..৮৭
২৮ ।গোপন স্থাপনার ছবি তুলে নিয়ে গেলেন ভারতীয় সেনা সদস্যরা.......৯০
২৯ ।চার বছরে অনেক সেনা সদস্য লাঞ্ছিত হলেও দায়ীদের
বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি...৯২
৩০ ।সামরিক পর্যায়ে ভারতের সাথে লেনদেন হবে
স্বাধীনতা চেতনার পরিপন্থী...৯৩
৩১ ।আ'লীগকে জনগনের দেয়া ভোট সেনাবাহিনী
পুলিশ বিডিআর ও চারদল চুরি করেছে...৯৬

মুখবন্ধ

আওয়ামী লীগ শাসনামলের শেষ দিকে 'প্রধানমন্ত্রীর প্রেস উইং'- থেকে 'প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সশস্ত্র বাহিনী সংক্রান্ত বক্তৃতামালার সংগ্রহগ্রন্থ' প্রকাশ করা হয়। উক্ত 'সংগ্রহগ্রন্থে'র ব্যাক কভারে ছাপা হয় শেখ হাসিনার উদ্ধৃতি। এতে তিনি বলেন, "আমাদের জাতীয় সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান দায়িত্ব দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা।... আমাদের সশস্ত্রবাহিনী প্রশংসনীয় ভূমিকা পালন করেছে। বিদেশে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন শান্তিরক্ষা মিশনে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যরা দক্ষতার সাথে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। এর ফলে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। ... এসব কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে সশস্ত্র বাহিনীর সদস্যগণ জনগণের আস্থা ও ভালবাসা অর্জন করেছে। ..." এছাড়া উল্লেখিত গ্রন্থের ভূমিকায়ও তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ধৃতি দেয়া হয়। সেখানে তিনি বলেন, "সশস্ত্র বাহিনী জাতীয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে অন্যতম এবং জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতীক। সরকার আসবে, সরকার যাবে, কিন্তু দেশ থাকবে, দেশের জনগণ থাকবে, সংবিধান থাকবে এবং জাতীয় পতাকা থাকবে। আর এগুলোর সংরক্ষণের জন্য থাকবে সশস্ত্র বাহিনী।"

সশস্ত্র বাহিনীর বিভিন্ন অনুষ্ঠানে প্রদত্ত এমন ৪০টি বক্তৃতা উল্লেখিত 'সংগ্রহগ্রন্থে' সংকলিত হয়েছে। এর প্রতিটি লাইনে রয়েছে সশস্ত্রবাহিনী প্রীতি, দায়িত্বশীলতার কথা। কিন্তু সেই শেখ হাসিনাই মাত্র ক' মাসের ব্যবধানে যখন ২০০১ সালের ১ অক্টোবরের নির্বাচনে পরাজিত হলেন তখন বললেন সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। আশ্চর্যের ব্যাপার, দেশের সকল রাজনৈতিক দল সংসদ নির্বাচনে সেনা মোতায়েনের পক্ষে সুপারিশ করলেও একমাত্র আ'লীগ এর বিরোধিতা করে। শুধু তাই নয় নির্বাচনী ফলাফল ঘোষণার পর শেখ হাসিনা প্রকাশ্যে ৭ অক্টোবর ২০০১ তারিখে বলেন, "আ'লীগকে জনগণের দেয়া ভোট সেনাবাহিনী চুরি করেছে।"

এই হচ্ছে আওয়ামী রাজনীতির স্ববিরোধিতা। তাই দেখা যায় শেখ হাসিনা আ'লীগ সভানেত্রীর দায়িত্বভার গ্রহণের পর প্রথম লন্ডন সফরের সময় সাংবাদিকদের কাছে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে 'ধর্ষক' হিসেবে চিহ্নিত করতে মোটেও কার্পণ্য করেননি। এব্যাপারে বিবিসি খ্যাত সাংবাদিক সিরাজুর রহমান তার এক নিবন্ধে বলেন, "আওয়ামী লীগের নেত্রী হবার পরে প্রথম বিলেত সফরে তিনি

(শেখ হাসিনা) উত্তর-পশ্চিম লন্ডনের পার্ক রোডে এক বাংলাদেশী রেস্তোরায় সংবাদ সম্মেলন দেন। শেখ হাসিনা বলেছিলেন যে, পার্বত্য চট্টগ্রামে বাংলাদেশী সেনারা অমানুষিক বর্বরতা চালাচ্ছে। আমি তাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলাম যে, বাংলাদেশী সেনারা আমাদেরই লোক এবং তারা কতখানি নীচে নামতে পারে তার একটা সীমা থাকবেই। আওয়ামী লীগ নেত্রী ধমকের এবং শাসনের সুরে আমাকে বলেন, 'কি রেটে ধর্ষণ চালাচ্ছে দেখে আসুন গিয়ে।' আমি তখন হাসিনাকে আরও বলেছিলাম যে, বিদেশে বসে দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনী সম্পর্কে এমন বিরূপ মন্তব্য করা উচিত নয়।" (ধর্ষণ নিয়ে রাজনীতি বনাম রাজনীতির ধর্ষণ, সিরাজুর রহমান, দৈনিক ইনকিলাব, ১৯/০১/২০০২)।

এ জাতীয় বৈপরীত্যে পূর্ণ মন্তব্য পাশাপাশি রেখে যে কেউই বুঝতে পারবেন সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কে আসলে আ'লীগের মনোভাব কী? এই বইটিতে সে চিত্রই ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। বিশেষ করে ক্ষমতায় থাকাকালে প্রতিরক্ষা বাহিনীকে ঘিড়ে আ'লীগ যেসব অনাকাংখিত আচরণ করেছে তাই এখানে স্থান পেয়েছে। এর বেশীর ভাগই রিপোর্ট আকারে দৈনিক দিনকাল ও দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত হয়েছে ১৯৯৬ থেকে ২০০২ সাল পর্যন্ত। এর পূর্বে প্রকাশিত নিবন্ধও স্থান পেয়েছে বইয়ের পাতায়। এছাড়া আরো দু'য়েকজন কলামিস্ট ও রিপোর্টারের লেখাও অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

বইটি প্রকাশের ক্ষেত্রে দৈনিক ইনকিলাব-এর সম্পাদক জনাব এএমএম বাহাউদ্দিন অকুণ্ঠ সহযোগিতা করেছেন। এছাড়া মে.জে. (অব.) এম এ মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি; মে.জে. (অব.) ইমামুজ্জামান, বীর বিক্রম, পিএসসি, দৈনিক ইনকিলাব এর চীফ রিপোর্টার মঞ্জুরুল আলম, বিশেষ সংবাদদাতা এলাহী নেওয়াজ খাঁন ও সাংবাদিক, কলামিষ্ট আহমেদ মুসা দিক নির্দেশনা প্রদান করে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন। এজন্যে সকলের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।

ধন্যবাদান্তে-

আবু রুশ্‌দ

ঢাকা

০১ জুন ২০০২

আওয়ামী লীগ ও সশস্ত্র বাহিনী

শৈবাল দীঘিরে বলে উচচ করে শির ... । এ প্রবাদ বাক্যটি আজ সত্য হতে চলেছে বাংলাদেশে আওয়ামী লীগের সেনাবাহিনী প্রীতিতে উথলে ওঠা দেখে। একে হঠাৎই বলা যায়। এইতো সেদিন, যেদিন তারা ছিল ক্ষমতা বৃত্তের বাইরে, '৭৫-এর পট পরিবর্তনের পটভূমিকায় গড়ে ওঠা সেনাবাহিনী সেদিনও ছিল তাদের চক্ষুশূল। পত্র-পত্রিকার কলাম হ'তে শুরু করে, চায়ের আড্ডা, রাজনীতির মঞ্চ সেদিনও সরগরম হয়ে উঠতো তিনদিকে ভারত ঘেরা এই ছোট্ট দেশটির ছোট্ট সেনাবাহিনীর জন্য বরাদ্দকৃত বাৎসরিক বাজেট নিয়ে। আওয়ামী লীগ ঘরানার বুদ্ধিজীবীরা অবাক বিস্ময়ে জানতে চাইতেন সেনাবাহিনীর পিছনে অর্থব্যয়ের যুক্তি কোথায়? এখানে ছিল না কোন বাস্তবতা, ছিল না তথ্যের উপস্থাপনা; ছিল বাচালতা, আজন্ম বিদ্বেষের আড়ালে লুকোনো ছিল সত্যের উচ্চারণ।

অথচ '৯৬ সালে ক্ষমতায় আসার পর! প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী শেখ হাসিনা বিনা নোটিশে ছুটে গিয়েছেন সৈনিকদের মাঝে। সৈনিক মেসের টেবিলে বসে খেয়েছেন সাধারণ সৈনিকের জন্য বরাদ্ধকৃত খাবার। আন্ডারকমান্ড'দের তত্ত্ব-তালাশে এভাবেই ব্যস্ত তিনি। এইতো ২৩ জুন' ৯৬ পলাসী দিবসে শপথ নেয়ার পরপর প্রথমেই তিনি ছুটে গিয়েছিলেন ঢাকা সেনানিবাসে, সাভার এরিয়া'র অফিসারদের পাশে বসে প্রত্যক্ষ করেছিলেন বেঙ্গল টাইগারদের 'আকর্ষণীয় সামরিক মহড়া'। আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনী বিদ্বেষী নয়, নয় শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠনের অন্তরায় একথাই আজ বারবার বলছেন আওয়ামী নেত্রী শেখ হাসিনা। এদিকে '৯৭ সালে নৌ-বাহিনী জাহাজ উদ্বোধন, বিমান ঘাটিতে অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান পরিদর্শন শেষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে সশস্ত্রবাহিনী সংগঠনের একমাত্র কৃতিত্বের দাবী তুলে দিয়েছেন তাঁর মরহুম পিতা শ্রদ্ধেয় 'বঙ্গবন্ধু'র হাতে। এনিয়ে টেলিভিশনের পর্দায় দীর্ঘ দশ মিনিটের জন্য দেখানো হয়েছে চট্টগ্রাম নৌঘাটি এলাকায় বঙ্গবন্ধু'র পদচারনা। মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান উদ্বোধনের সময়ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গায়ে চড়িয়েছেন এয়ার চীফ মার্শাল-এর ড্রেস।

এসব দেখেশুনে যে কারোরই মনে হতে পারে ক্ষমতার রাইরে থাকার সময় আ'লীগ এন্টি এস্টাবলিষ্টমেন্ট কথাবার্তা বললেও এখন রাষ্ট্র ক্ষমতায় এসে পজেটিভ মনোভাব প্রদর্শন করছে। কথাটা আপাতদৃষ্টিতে মিথ্যা নয়। বিএনপি'র একজন সাবেক সংসদ সদস্য ও সেনা কর্মকর্তা মেজর আখতারুজ্জামানের মতে আ'লীগ সৈনিক ও অফিসারদের বাহ্যিকভাবে মধুর সব কথাবার্তা বলছে। সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জন করা যায় এমন সব পদক্ষেপও নিয়েছে। কিন্তু এসব করে মূলতঃ এরা সেনাবাহিনীকে হাতে রাখতে চাইছে। ভাবছে সুযোগ-সুবিধা বাড়িয়ে দিলে সেনা সদস্যরা মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে থাকবে। যদিও আ'লীগ এই সুবিধাগুলো দিতে পারছে জে. এরশাদ ও বেগম খালেদা জিয়ার শাসনামলে সূচিত আধুনিকায়ন প্রক্রিয়ার বদৌলতে।

যাহোক, এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান। অত্যন্ত পেশাদার ও দক্ষ এ বাহিনীর সদস্যরা কোন

রাজনৈতিক দলের ক্যাডার বা সমর্থক নন। বিএনপি, জাতীয় পার্টি যেমন সশস্ত্রবাহিনীকে তাদের দলভূক্ত বলে দাবী করতে পারে না তেমনি আ'লীগেরও উচিত নয় এ নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত মাতামাতি করা। বিশেষ করে এদলটির সমর্থক বুদ্ধিজীবীরা আ'লীগ ক্ষমতায় আসার পূর্বে যেভাবে শক্তিশালী সশস্ত্রবাহিনী গঠনের বিরোধিতা করেছেন ক্ষমতায় আসার পরও ঠিক একই কায়দায় এদের অনেকেই প্রত্যক্ষ, পরোক্ষভাবে সশস্ত্রবাহিনী বিদ্বেষী মন্তব্য করায় পিছপা হননি। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো সভা, সেমিনার বা পত্র-পত্রিকায় সশস্ত্রবাহিনী বিদ্বেষী সুক্ষ্ম প্রচারনা চালানো হলেও ক্ষমতায় থেকে আ'লীগ রাজনৈতিকভাবে এধরনের মন্তব্য বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এড়িয়ে চলেছে। তবে তারপরও মাঝে মাঝে এর নেতৃবৃন্দ এমন সব কথা প্রকাশ্যে বলে ফেলেন যা সশস্ত্রবাহিনীকে দলীয়করণের নগ্ন প্রয়াস বলেই সচেতন সকলের কাছে মনে হতে পারে।

এব্যাপারে আমরা দু'টি প্রসঙ্গের উল্লেখ করতে পারি। এর একটি হলো সশস্ত্রবাহিনী সদস্যদের সামনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভাষণ। অপরটি হলো আওয়ামী বুদ্ধিজীবী জনাব এম, আর, আখতার মুকুলের একটি লেখা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে ঘিরে সরকারী মহল থেকে যে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে তা নিয়ে সচেতন দেশবাসীর মনে দেখা দিয়েছে নানা প্রশ্ন। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় কোন রাজনৈতিক দল সশস্ত্রবাহিনীকে রাষ্ট্রক্ষমতা গ্রহণ বা কারো পক্ষাবলম্বন করার কথা না বললেও স্বয়ং সরকার প্রধান সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে 'বিভ্রান্তি সৃষ্টি' না করার জন্য আহবান জানিয়েছেন আগ বাড়িয়ে। এক্ষেত্রে গত ৮ জুন ১৯৯৭ সালে সৈনিকদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর দেয় ভাষণের উল্লেখ করা যায়। 'সশস্ত্রবাহিনীকে রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে রাখুন' বলে আপাত উদাত্ত আহবান জানালেও ঐ একই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের প্রধান বিরোধী দল বিএনপিকে 'সশস্ত্রবাহিনীর মূল অনিষ্টকারী' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন সম্পূর্ণ রাজনৈতিকভাবে। বিএনপি সম্পর্কে তাঁর উত্থাপিত অভিযোগগুলি মারাত্মক। যেহেতু তার এই অভিযোগ সশস্ত্রবাহিনীর মতো একটি স্পর্শকাতর জাতীয় প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত, সেহেতু বিষয়টি নিঃসন্দেহে পর্যালোচনার দাবী রাখে।

প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ হিসেবে যেসব বিষয় বেরিয়ে এসেছে সেগুলো হলোঃ- (১) স্বাধীনতা পরবর্তী আ'লীগ সরকারই একমাত্র সশস্ত্রবাহিনীকে সংগঠিত, সুসজ্জিত করে ও আধুনিকায়নের পথে নিয়ে যায় এবং নিশ্চিতভাবেই '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলো গত ২১ বছরে সে ধারা অব্যাহত রাখতে পারেনি; বরং পদে পদে আধুনিকায়নের সে ধারা ব্যাহত করা হয়েছে। (২) আ'লীগ সরকার বিশেষ করে 'বঙ্গবন্ধু' সেনাবাহিনী অন্তঃপ্রাণ ছিলেন বলে তাঁর বড় সন্তান যেমন বর্তমান ১৯তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি'র সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, তেমনি তাঁর ছোট ছেলে শেখ জামাল '৭৫-এ কমিশনড্ অফিসার হিসেবে যোগ দেন সেনাবাহিনীতে। (৩) '৭৫ পরবর্তী সরকারের নাম উল্লেখ না করলেও তাঁর কথা মতো শহীদ জিয়ার আমলে সেনাবাহিনীতে ১৭টি ক্যু সংঘঠিত হয়; এবং 'বিনা বিচারে' সহস্রাধিক সেনা সদস্য প্রাণ হারান। এছাড়া '৭৫ এর পর সেনাবাহিনীতে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয় বিভক্তি, অন্তর্দ্বন্দ্ব, ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ। এমনকি সে সময়ে সরকার সেনাবাহিনীর ইউনিটও বিলুপ্ত ঘোষণা করেন সেনাবাহিনীকে কাট-টুসাইজ করার জন্য, যার উদাহরণ হিসেবে ২২তম

ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিলুপ্তির কথা উল্লেখ করা হয়।

এদিকে প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ অভিযোগ ছাড়াও ২৩ জুন '৯৬-এ ক্ষমতায় আসার পর আ'লীগের পক্ষ থেকে 'আওয়ামী লীগ ও সেনাবাহিনী' শিরোনামে একটি বই প্রকাশ করা হয় ঐ বইতেও প্রধানমন্ত্রীর অনুরূপ অভিযোগ উত্থাপন করেন লেখক।

শেখ হাসিনা শুধু আওয়ামী লীগের সভানেত্রী নন, তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রীও। জাতীয় সশস্ত্রবাহিনীও শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ, বিএনপি, জাপা বা অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন নয়। কিন্তু ৮ই জুন '৯৭ সৈনিকদের সামনে প্রধানমন্ত্রী যেভাবে পার্টিজান দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিলেন তা সচেতন দেশবাসীর কাছে এক অবাক করা ব্যপার বৈকি।এদিকে সম্প্রতিককালে বাংলাদেশের সামরিক সাজ-সরঞ্জাম ক্রয় নিয়েও সর্বমহলে বইছে আলোচনা-সমালোচনার ঝড়। পূর্বে এসব বিষয় ছিল 'অতি গোপনীয়' টপ সিক্রেট। '৯১-সাল হতে গণতান্ত্রিক পরিবেশের বদৌলতে এখন 'পর্দার অন্তরালের' অনেক কিছুই খোলামেলা উন্মুক্ত। বলা যেতে পারে জনগণের সামনে জবাবদিহিতার প্রক্রিয়া অন্তত শুরু হয়েছে। এক্ষেত্রে সামরিক বাহিনী, প্রতিরক্ষা ক্রয় ইত্যাদি নিয়ে বহুজনই বহু কথা বলেছেন। তবে এসবের বেশীরভাগ এখনো দলীয় রাজনীতির গন্ডী অতিক্রম করতে পারেনি। আবার অনেকে অতিমাত্রায় সংবেদনশীল হয়ে এমন সব প্রসঙ্গ উত্থাপন করছেন যা তথ্য ও যুক্তিপূর্ণ বিতর্কের পথে না গিয়ে যাচ্ছে প্রতিরক্ষা খাত ও ক্ষেত্রবিশেষে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে। বরং প্রকাশ্যে সভা-সেমিনারে সশস্ত্রবাহিনীর আয়তন কমিয়ে আনার প্রস্তাব দেয়া থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তর বা ডিজিএফআই-কে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেয়ার সুপারিশ গণতান্ত্রিক অধিকার চর্চার আড়ালে 'ভিন্ন কিছুর' কথাই আমাদের মনে করিয়ে দেয়। আবার এমনও দেখা যাচ্ছে যে, বেশকিছু 'হঠাৎ সশস্ত্রবাহিনী প্রেমিক' অন্য আর দশটা পাঁচটা ইস্যুতে '২১ বছরের' কথা যেমন টেনে আনেন তেমনি এক্ষেত্রেও চ্যাম্পিয়ন হতে চাচ্ছেন সমান তর্জন-গর্জনের সাথে। এরই লেটেস্ট সংস্করণ হচ্ছেন এম. আর. আখতার মুকুল। শ্রদ্ধেয় শেখ মুজিবের ভাষায় যেই 'মুকুল এখনো ফুটেনি' সেই মুকুল সাহেবই এবার প্রতিরক্ষা বিষয়ে 'চরমপত্র' দিয়েছেন বিগত '২১ বছরের সরকারগুলোকে'।

উল্লেখ্য, 'বিষয় হচ্ছে মিগ-২৯' শিরোনামে গত ১৩ জুলাই '৯৯ সংখ্যা দৈনিক ইত্তেফাকে জনাব এম আর আখতার মুকুলের একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। '১৩' সংখ্যাটি অপয়া বলেই কিনা জানিনা, তিনি তাঁর নিবন্ধে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা খাতের যাবতীয় দুর্গতির জন্য দায়ী করেছেন বিএনপিসহ অপরাপর জাতীয়তাবাদী শক্তিকে। বলেছেন, এরা সবাই হচ্ছে আধুনিক সশস্ত্রবাহিনীর জন্য অপয়া-অনাকাংখিত। যদিও তাঁর নিবন্ধের শিরোনাম মিগ-২৯ নিয়ে, কিন্তু এর বেশিরভাগ স্থান জুড়ে আছে আ'লীগ বিরোধীদের প্রতি বিষোদগার ও এ সম্পর্কিত একরাশ ভুল তথ্যের উপস্থাপনা। এক্ষেত্রে জনাব মুকুল যেসব প্রসঙ্গের অবতারনা করেছেন তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো নিম্নরূপঃ

১। আ'লীগ শাসনামলের 'মাত্র ৩৬ মাস সময়ের মধ্যে বাংলাদেশের নৌ, বিমান ও পদাতিক বাহিনীতে আরো প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগত দতা অর্জন এবং এই তিনটি বাহিনীতে আধুনিকীকরনের জোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সর্বত্র এখন

কর্মচাঞ্চল্যের উদ্দীপনা। এরই ফলে ইতিমধ্যে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে জাতিসংঘের অধীনে শান্তি রক্ষাবাহিনী হিসেবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ইউনিটগুলো সুনাম অর্জনে সক্ষম হয়েছে।'

২। 'যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে সশস্ত্রবাহিনী গড়ে তোলার বিষয়টি ছিল সবচেয়ে দুরূহ। এটা এমন একটা সময় যখন সশস্ত্রবাহিনীর জন্য প্রয়োজনীয় সমরাস্ত্র তো দূরের কথা, এদের বাসস্থান; এবং জুতা ও পোশাক পরিচ্ছদের পর্যন্ত ভয়ংকর অভাব বিদ্যমান ছিল। ...... বঙ্গবন্ধু স্বয়ং উদ্যোগ গ্রহণ পূর্বক সমরাস্ত্র সংগ্রহ থেকে শুরু করে সামরিক সেক্টরে প্রয়োজনীয় পুনর্বাসনের কাজ সম্পন্ন করেন। তার অন্যতম লক্ষ্য ছিল একটাই এবং তাহলো দ্রুত সশস্ত্রবাহিনীকে পুনর্গঠন করা।'

৩। '১৯৭৫ সালের নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে সৈন্যবাহিনীতে শৃংখলা ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে মেজর জেনারেল খালেদ মোশাররফ একটা সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে খন্দকার মোশতাককে সরিয়ে দিলেও মাত্র তিনদিনের মাথায় একটা পাল্টা সামরিক অভ্যূত্থানে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। .... এসময় জাসদ-এর গণবাহিনীর কর্মকান্ডে বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর অভ্যন্তরে শৃংখলার অভাব প্রকটভাবে দেখা দেয়। জিয়াউর রহমান এই গণবাহিনীকে শায়েস্তা করতে যেয়ে ঢাকার কারাগারের অভ্যন্তরে একটা প্রহসনমূলক বিচারে কর্ণেল তাহেরকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেন।'

৪। 'জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ছোট-বড় মিলিয়ে প্রায় ১৭-১৮টা ক্যু'র প্রচেষ্টা হয়েছিল। জিয়াউর রহমান নির্মম হস্তে এসব দমন করেছিলেন।'

৫। '....৯ বছর 'স্বৈরাচারী' এরশাদ এবং পাঁচ বছরকাল 'স্বৈরাচার' হিসেবে আখ্যায়িত বেগম খালেদা জিয়ার সময়কাল। সর্বত্র শুধু দুর্নীতি এবং গণতন্ত্র বিরোধী কর্মকান্ডের অভিযোগ। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট থেকে শুরু করে ১৯৯৬ সালের মার্চ পর্যন্ত সময়কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস উপস্থাপন করার কারন একটাই এবং তা হচ্ছে, এই দীর্ঘ ২১ বছর সময়কালে (জিয়া-সাত্তার-এরশাদ-খালেদা) বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ কোনটাই সম্ভব হয়নি।'

৬। '.... এমনও রিপোর্ট রয়েছে যে প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান তো একবার বিমান বাহিনীকে ভেঙ্গে দিয়ে সেনাবাহিনীর অধীনে একটা ইউনিটে পরিণত করতে আগ্রহী হয়েছিলেন। .....'

৭। 'প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে আমরা দেখেছি যে, প্রধান সেনাপতি জেনারেল নাসিম ও উচচ পদস্থ আরো জনাকয়েক সামরিক অফিসারকে পদচ্যুত করার জন্য বঙ্গভবন এবং টেলিভিশন কেন্দ্রকে ট্যাংক দিয়ে ঘেরাও করে টিভির স্টুডিও থেকে সেই ঘোষণা দিচ্ছেন। এরচেয়ে লজ্জার আর কি হতে পারে?'

এভাবে আরো বহু 'চমকপ্রদ' তথ্য জনাব মুকুলের লেখায় থাকলেও সবকিছুর বিচার বিশ্লেষন করতে গেলে রীতিমতো 'সপ্তকান্ড' লিখতে হয়। তবে সেনাবাহিনী সম্পর্কে আওয়ামী লীগের মনোভাব নিয়ে ইতিহাস সচেতন সকলেই কম-বেশি অবগত আছেন। তারপরও সেনাবাহিনী সংক্রান্ত বিতর্কে বিএনপিকে টেনে আনায় প্রধানমন্ত্রী ও মুকুল সাহেবের মতো আওয়ামী বুদ্ধিজীবীদের বক্তব্যসমুহ পর্যালোচনার দাবি রাখে। এখানে ধারাবহিকভাবে এ প্রসঙ্গে আলোকপাত করা হলো।

ক। সশস্ত্রবাহিনীর রাজনীতিকীকরণ ও দলীয়করণ প্রসঙ্গ

শেখ হাসিনা সশস্ত্রবাহিনীকে রাজনৈতিক বিতর্কের উর্ধ্বে রাখতে বলেছেন। এটি একটি উত্তম বক্তব্য। সশস্ত্রবাহিনী রাজনৈতিক কোন প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু সাধারণ সৈনিকদের সামনে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে বিষোদগার কি সেনা সদস্যদের মাঝে প্রকাশ্যে রাজনৈতিক ক্যাম্পেইন চালানোর শামিল নয়? অবশ্য সশস্ত্রবাহিনীকে স্বীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারে আওয়ামী লীগের ঐতিহ্য মোটেও নতুন নয়। এই আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দই একসময় বাকশাল গঠন করে তিনবাহিনী প্রধানকে বাকশালে যোগ দিতে বাধ্য করেছিল। এটি যদি জাতীয় সেনাবাহিনীর দলীয়করণ না হয়, তাহলে দলীয়করণ কাকে বলা যাবে?

শেখ মুজিব তথা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ সেনাবাহিনীকে 'পছন্দ' করতেন, তাই শেখ কামাল ১৯তম ডিভিশনের জিওসির (১৯৯৭ সালের) সাথে যুদ্ধে গিয়েছিলেন, এ দাবি করেছেন শেখ হাসিনা। কিন্তু ইতিহাস ঘেঁটে কি কেউ বলতে পারবেন, ১৯তম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি যখন '৭১-এ যুদ্ধে লড়েছেন অমিত বিক্রমে তখন শেখ কামাল কত-তম সেক্টরে, কোথায় অস্ত্র হাতে যুদ্ধ করেছেন?

আর শেখ জামাল? তার কমিশন পাওয়া? সেনাবাহিনীতে কি 'বাবার' ইচ্ছে হলেই কমিশন পাওয়া যায়? এটা কি দলীয় বা ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠান? অথচ এই ব্যক্তিগত ইচ্ছা থেকেই কিন্তু সেদিন শেখ জামালকে সেনাবাহিনীতে কমিশন দেয়া হয়েছিল এবং শেখ জামালই হচ্ছে বাংলাদেশে সেনাবাহিনীর একমাত্র অফিসার যাকে কোন নির্বাচনী পরীক্ষা ছাড়াই মনোনয়ন দেয়া হয়েছিল শেখ মুজিবের সরাসরি নির্দেশে। এ ব্যাপারে শেখ মুজিবের তৎকালীন বন্ধু-সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকারানহাসের 'বাংলাদেশ -এ লিগেসী অব ব্লাড' বই থেকে জানা যায়, "শেখ মুজিব তাঁর দ্বিতীয় ছেলে জামালকে সেনাবাহিনীর উচচ পদের জন্য তৈরী করছিলেন........। মুজিব জামালকে আর্মিতে ঢুকিয়ে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের জন্য ইয়োগোশ্লাভ মিলিটারী একাডেমীতে পাঠিয়ে দেন। জামাল ওখানকার পড়াশোনায় সম্ভবত কুলিয়ে উঠতে না পেরে মুজিবকে দারুণভাবে হতাশ করে ঢাকা ফিরে আসে। এরপর মুজিব তাকে বিলেতের স্যান্ডহার্ষ্ট মিলিটারী একাডেমীতে পাঠাতে চাইলেন। তিনি তখন সেনাবাহিনীর চীফ অফ স্টাফ- জেনারেল শফিউল্লাকে বললেন, তিনি যেন জামালকে স্যান্ডহার্ষ্ট-এ ক্যাডেট হিসেবে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। এতে এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কারন স্যান্ডহার্ষ্ট-এর ক্যাডেটদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও নিয়ম-কানুন পালন সাপেক্ষে বাছাই করা হয়। আর সেখানে জামালের চাইতে অনেক মেধাবী ও অধিকতর যোগ্য প্রার্থীও ছিল। ফলে এটা ধারণা করা হয়েছিল যে, বৃটেনের মিলিটারী একাডেমী জামালকে যোগ্য বলে বিবেচনা করবে না। কিন্তু একটা দেশের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ বিবেচনা করে তারা ৬,০০০ পাউণ্ড প্রশিক্ষণ ফীসহ বিশেষ ব্যবস্থায় জামালকে গ্রহণ করতে রাজী হলো। ..... ঐ টাকা অর্থ মন্ত্রালয়ের অজ্ঞাতে বিশেষ আর্মি চ্যানেলে গোপনীয়ভাবে স্যান্ডহার্ষ্ট-এ পাঠানো হয়েছিল।"

তখনকার অর্থ মানে এই ৬,০০০ পাউন্ড আপন 'পুত্রের' কমিশনের পিছনে

ব্যয় কি সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের অর্থ ব্যয় হিসেবে ধরা হবে নাকি 'পিতার ইচ্ছায় পুত্রের বিলেত যাত্রা' বলে চিহ্নিত করা হবে? '৭৫ পরবর্তী কোন সরকার প্রধান কোন 'পুত্র'কে সেনাবাহিনীর কমিশন পাইয়ে দেয়ার জন্য ৬,০০০ পাউন্ড ব্যয় করেছিলেন কি?

খ। সেনাবাহিনীর আধুনিকায়ন প্রসঙ্গে

আ'লীগের দাবি মতে স্বাধীনতা পরবর্তী আ'লীগ সরকারই সশস্ত্রবাহিনীকে আধুনিকায়নের উদ্যোগ নেন যার ফসল আজকের সেনাবাহিনী। তবে তাদের কথামতেই গত ২১ বছরে সেই আধুনিকায়ন পদে পদে ব্যহত হয়েছে।

এবার দেখা যাক, সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কে আ'লীগ নেতৃবৃন্দ কি ভাবতেন এবং তাদের গৃহীত আধুনিকায়ন প্রক্রিয়াই বা কি ছিল? এ ব্যাপারে ১৭ আগষ্ট '৭৫ সংখ্যা লন্ডনের 'সানডে টাইমস' -এ প্রকাশিত এক নিবন্ধের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এতে বলা হয়, 'সামরিক বাহিনীর প্রধান হওয়া সত্ত্বেও মুজিব সেনাবাহিনীকে অবিশ্বাস করতেন। বাংলাদেশ আন্দোলনে প্রশংসনীয় ভূমিকা রয়েছে, এমন অনেক সামরিক অফিসারের মর্যাদা ক্ষুন্ন কঁরার কোন সুযোগ তিনি ছাড়তেন না। স্পষ্টতঃই তাদের উপর তিনি গোয়েন্দাগিরি চালাতেন।' এ প্রসঙ্গে এ্যান্থনী ম্যাসকারানহাস তার 'বাংলাদেশ - এ লিগেসী অব ব্লাড' গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে, 'মিলিটারী'র সব কিছুতেই শেখ মুজিবের দারুন ঘৃণা জন্মে গিয়েছিল...। মুজিব আর তাঁর মন্ত্রীবর্গ সেনাবাহিনীর ভূমিকা সম্পর্কে উদাসীন হয়ে পড়েন। দেশ পরিচালনায় দায়িত্বভার নেয়ার পর একমাস যেতে না যেতেই তিনি ভারতের সাথে পঁচিশ বছর মেয়াদী এক মৈত্রী ও পারস্পরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। বহিঃশত্রুর আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষার জন্য ভারতের সহযোগিতা কামনা করা হয়েছিল। সুতরাং ঐ চুক্তির মাধ্যমে দেশের জন্য একটি কার্যকরী সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই বলেই ধরা হলো। সেনাবাহিনীকে কমিয়ে ফেলা হলো এবং প্রতিরক্ষাবাহিনীর প্রশিক্ষণ সংক্ষিপ্ত করা হলো। সেনাবাহিনী কেবল রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাহন হিসেবে পরিগণিত হলো। ১৯৭৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে শেখ মুজিব নিজেই আমাকে (মাসকারানহাস) বলেছিলেন যে, তিনি একটা শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠনের বিরুদ্ধে। ..... শেখ মুজিব চেয়েছিলেন সেনাবাহিনীকে নিঃশেষ করে দিতে"।

সবাই জানেন, কথিত 'আধুনিকায়নের' প্রমাণ হিসেবে আ'লীগ আজ '৭৪ সালে মিসর থেকে আনা ৩০টি ট্যাংকের কথা বলছে। মিসর সরকার যখন মুজিবকে সেই ট্যাংক গ্রহণের প্রস্তাব দেয় তখনও "ঐ প্রস্তাব তাঁর মনে ভীতির সঞ্চার করে। তিনি ট্যাংক বহর উপহার হিসেবে গ্রহণ করতে উৎসাহ দেখাতে পারলেন না। সেনাবাহিনীর ব্যাপারে তাঁর চিন্তা-ভাবনায় এ উপহারকে এক কটাক্ষ বলে মুজিব মনে করলেন।"
(এ্যান্থনী মাসকারানহাস ঃ 'বাংলাদেশ -এ লিগেসী অব ব্লাড' অধ্যায়-৪)

সেনাবাহিনী সম্পর্কে তদানীন্তন আওয়ামী নেতৃত্বের মনোভাব সম্পর্কে উপরোক্ত প্রমাণাদি ছাড়াও এতদসংক্রান্ত আরো কিছু তথ্য পাওয়া যায় বিবিসি-বাংলা

বিভাগের প্রধান এস এম আলীর লিখিত 'Civil-Military Relatiorns in the Soft state : The case of Bangladesh' শিরোনামের নিবন্ধে। European Network of Bangladesh Studies এর ১/৬-৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত উক্ত নিবন্ধে লেখক তাঁর সাথে '৯১ সালে প্রাক্তন সেনা প্রধান মে. জে. শফিউল্লার এক সাক্ষাৎকারের উদ্বৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, 'মুজিব তাঁর সেনা প্রধানকে বলেছিলেন, তাঁর (মুজিব) কোন সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই। যদি কখনো প্রয়োজন হয় তাহলে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে বললেই ভারতীয় সেনাবাহিনী তাঁর (মুজিবের) সহায়তায় ছুটে আসবে।'

শেখ মুজিব সেনাবাহিনীকে বিশ্বাস করতেন না -এ কারণেই সেনাবাহিনীর বিকল্প হিসেবে তিনি 'জাতীয় রক্ষী বাহিনী' নামে একটি 'জলপাই রং' এর পোশাকপড়া প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তিনি মোটেও আস্থায় নিতে পারেননি বলেই শ' শ' যোগ্য মুক্তিযোদ্ধা অফিসার, এমনকি জেনারেল ওসমানীর মতো সংগঠক থাকার পরও তিনি রক্ষীবাহিনী গঠনের জন্য ডেকে পাঠালেন ভারতীয় মেজর জেনারেল এস এস উবানকে। এ ব্যাপারে মে. জে. উবান তাঁর লেখা 'ফ্যান্টমস অব চিটাগাং -দ্য ফিফথ আর্মি ইন বাংলাদেশ' বইয়ে উল্লেখ করেন "শেখ মুজিব একটি নতুন বাহিনী গঠনের চিন্তা-ভাবনা করছিলেন; যাতে তার ভিতর মুক্তিবাহিনীর দেশপ্রেমিক অংশ এবং মুজিববাহিনীর সদস্যদের আত্মীভূত করা যায়।..... মুজিব তাঁর এই চিন্তা-ভাবনা নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করলেন এবং ঐক্যমত্যে পৌছানোর পর তিনি নতুন একটি বাহিনী গঠনের নির্দেশ দিলেন। এর নামকরণ করলেন জে আর বি বা জাতীয় রক্ষী বাহিনী"। একইভাবে 'জাতির জনক' সেদিন নিজ সেনাবাহিনীর মুক্তিযোদ্ধা অফিসার বা জোয়ানদের মাঝেও কোন 'দেশপ্রেমিক' খুঁজে পাননি। আর এ কারণেই তিনি সেদিন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে শ' শ' কর্নেল, মেজর, ক্যাপ্টেন থাকার পরও রক্ষী বাহিনীর প্রশিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করেছিলেন ভারতীয় মেজর ভোহরা ও মেজর রেড্ডিকে।

এরও পূর্বে 'স্বাধীনতার চেতনার' ধারক আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দই ১৯৭১ সালের অক্টোবরে ভারত সরকারের সাথে একটি '৭ দফা গোপন-চুক্তিতে' উপনীত হন - যার অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল 'বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না।'

বস্তুতঃ '৭২-'৭৫ পর্যন্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে আধুনিকায়ন তো দূরের কথা উল্টো এই প্রতিষ্ঠানকে আর্থিক ও মনোজাগতিক দু'পর্যায়েই অবহেলা করা হয়। অথচ বিপরীতে রক্ষীবাহিনীকে সেনাবাহিনী অপেক্ষা আধুনিক সমরাস্ত্রে সজ্জিত করা হয় সকলের বিস্মিত দৃষ্টির সামনেই। একথা তো সচেতন কারো অজানা নয় যে, সে সময়ে সেনাবাহিনীর মোট সদস্য সংখ্যার প্রায় সমান সংখ্যক ২৫,০০০ রক্ষীবাহিনী সদস্য রিক্রুট করা হয় এবং এইসব সদস্যের জন্য তদানীন্তন আ'লীগ সরকার তুলনমূলকভাবে অনেক, অ-নে-ক বেশি সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করে। এ ব্যাপারে ১৭ আগষ্ট '৭৫ সংখ্যা লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'সানডে টাইমস' পত্রিকায় লেখা হয় 'মুজিবের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে অনুগত উচচ ট্রেনিংপ্রাপ্ত, সুসজ্জিত, ইউনিফর্মধারী রক্ষীবাহিনীকে অস্ত্রেশস্ত্রে, বেতনে-ভাতায়, ব্যয় বরাদ্ধে সামরিক বাহিনীর চেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয়া হতো।' এবং তদানীন্তন আওয়ামী সরকারের 'পরিকল্পনা থেকে বোঝা যায় যে, যখন চূড়ান্ত রূপ নেবে তখন রক্ষীবাহিনী পাকিস্তান, এমনকি বৃটিশ আমলে যে সেনাবাহিনী

মোতায়েন রাখা হত, (সংখ্যায়) তা ছাড়িয়ে যেতে পারে।" **(তথ্যসূত্র-মুজিব বাংলাদেশের মুনিব -জো গেভেনম্যান, শিকাগো ডেইলী নিউজ, ২৩ জুন, ৭৫ সংখ্যা)**। এই রক্ষীবাহিনীকে পোষণ করার জন্যে সেদিন যে অর্থ ব্যয় করা হয়েছে, তা আরেক ইতিহাস।

এই যখন ছিল ব্যক্তিগত বাহিনী হিসেবে রক্ষীবাহিনী পোষার ইতিহাস, তখন সেনাবাহিনীর কথিত 'আধুনিকায়ন'-এর বর্ণনাও কিন্তু কম আকর্ষণীয় নয়। '৭২-'৭৫ পর্যন্তবাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে ১১ ডিসেম্বর '৭৫ তারিখে এ্যান্থনী মাসকারানহাসের কাছে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে তদানীন্তন ব্রিগেডিয়ার এম, এ মঞ্জুর, বীর উত্তম উল্লেখ করেন, "এ দেশের সেনাবাহিনী একটি স্বেচ্ছাসেবক দলের মতো। আমাদের অফিসার এবং জোয়ানেরা সৈনিক হিসেবে তাদের ভবিষ্যৎ গড়তে চায় বলে তাদেরকে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবেই কাজ করতে হচ্ছে। বিনিময়ে তারা কি পেয়েছে? প্রত্যেকেই এরা হতভাগ্য, এদের খাবার নেই, তাদের কোন প্রশাসন নেই, অস্ত্রশস্ত্র নেই। তুমি অবাক হবে, তাদের জার্সি তা নেই-গায়ের কোট নেই, পায়ে দেয়ার বুট পর্যন্ত নেই। শীতের রাতে তাদেরকে কম্বল গায়ে দিয়ে পাহারা দিতে হয়। আমাদের অনেক সিপাহী এখনো লুঙ্গি পরে কাজ করছে। তাদের কোন ইউনিফর্ম নেই। তদুপরি তাদের উপর হয়রানি। ..... পুলিশ আমাদের লোকদের পিটাতো। (এখনও নব্য আওয়ামী লীগ আমলে ১৯৯৬ সালে পুলিশ সেনা অফিসারকে গাছের সাথে বেঁধে পিটিয়েছে)।

.... একবার আমাদের কিছু ছেলেকে মেরে ফেলা হলো। আমরা মুজিবের কাছে গেলাম। মুজিব কথা দিলেন তিনি ব্যাপারটি দেখবেন। পরে তিনি আমাদের জানালেন যে, আমাদের ছেলেরা কোলাবোরেটর ছিল বলে তাদের মেরে ফেলা হয়েছে।"

একই বইয়ে মাসকারানহাস আরেক সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি তুলে ধরেছেন এভাবেঃ "আমরা সত্যিকার অর্থে কোন সেনাবাহিনী ছিলাম না। কাগজপত্রে আমাদের কোন অস্তিত্বই ছিল না। সেনাবাহিনীর জন্য কোন আইনগত ভিত্তি ছিল না। টেবল অব অর্গানাইজেশন এন্ড এস্টাবলিশমেন্ট বলে কোন জিনিস ছিল না। সবই ছিল 'এড-হক'। সেনাবাহিনী বেতন পেতো, কারন, শেখ মুজিব তা দিতে বলেছিলেন। মুজিবের কথার ওপর আমাদের অস্তিত্ব নির্ভরশীল ছিল। আমাদের ছেলেরা নরকের যাতনায় ভুগছিলো, কিন্তু মুখ ফুটে কোন অভিযোগ করেনি।......."

এই যখন ছিল সেনাবাহিনীর অবস্থা, তা অনেকের বিস্ময়ের উদ্রেক করবে, এটাও স্বাভাবিক। এদিকে '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত প্রতিক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্ধ সম্পর্কে পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, '১৯৭২ সালে সশস্ত্রবাহিনীর জন্য বরাদ্দ করা হয়েছিল মাত্র ৩৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।'

(তথ্যসূত্রঃ Arms Control and Disarmament Agency, World Military Expenditure and Arms Transfers 1971-1980, [Washington DC, 1983] p.-৪০)

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর বলে '৭২ সালে প্রতিরক্ষা খাতে উক্ত ব্যয় বরাদ্ধ নিয়ে কোন বিতর্ক সৃষ্টি হয়তো কাম্য হতে পারে না। কিন্তু এ কথাতো অসত্য নয় যে, ১৬ ডিসেম্বর '৭১-এ যেদিন বাংলাদেশ স্বাধীন হয় সেদিন নিঃসন্দেহে বিজয়ী শক্তি হিসেবে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নামও ইতিহাসে লিপিবদ্ধ হয়েছিল। এবং

বিজয়ের এই অধিকার বলেই পরাজিত পাক সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পনকৃত বিপুল পরিমাণ অস্ত্র ও গোলাবারুদের ওপর বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর অধিকার ছিল প্রশ্নাতীত। কিন্তু ভারত প্রেমে কাতর আওয়ামী নেতৃবৃন্দের পরোক্ষ সমর্থনেই হোক অথবা অন্য যেকোন কারনেই হোক ভারতীয় বাহিনী ৯৮হাজার পাকসেনার ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র প্রকাশ্যেই ভারতে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে ভারতের কোলকাতা থেকে প্রকাশিত 'দৈনিক অমৃতবাজার' পত্রিকার ১২ মে '৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্ট হতে জানা যায় যে, "ভারত সরকার দুই হতে আড়াই শ' রেলওয়ে ওয়াগন ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে স্থানান্তরিত করিয়াছে"। যেখানে বাংলাদেশ সরকার স্বীয় সশস্ত্র বাহিনীর উন্নয়নকল্পে পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া আধুনিক সমরাস্ত্রকে অবলীলায় ব্যবহার করতে পারতো সেখানে সেই তারাই তাদের হিস্যা তুলে দিল 'বন্ধু' দেশের হাতে। কিন্তু কেন? এ প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট হলেও আজও দেশবাসীর কাছে স্পষ্ট নয় যে, কি কারনে ভারতীয় পত্রিকায় অস্ত্র পাচারের কথা স্বীকার করা হলেও তদানীন্তন অর্থমন্ত্রী ১৯৭৩ সালের ১১ জুলাই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদে ঘোষণা করেছিলেন "ভারতে কোন অস্ত্রশস্ত্র পাচার হয় নাই বা লইয়াও যায় নাই।" এভাবে সেদিন শুধু যে হাজার হাজার কোটি টাকা মূল্যের অত্যাধুনিক চাইনিজ রাইফেল, এলএমজি, এমজি, মার্টার, রকেট লাঞ্চার, কামান ও ৮৪টি ট্যাংকই ভারতে পাচার করা হয় তা নয় বরং চীন কর্তৃক নির্মিত জয়দেবপুর অর্ডন্যান্স ফ্যাক্টরী থেকে অস্ত্র নির্মাণ যন্ত্রপাতিও ভারতে স্থানান্তরিত হবার অভিযোগ পাওয়া যায়।"

(তথ্যসূত্রঃ জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-'৭৫, অলি আহাদ, পৃঃ ৪৪৯)

স্বাধীনতা পরবর্তী আ'লীগ সরকার যখন উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় অস্ত্র স্থানান্তরকরণের মাধ্যমে সেনাবাহিনী 'আধুনিকায়ণ' (!) প্রক্রিয়া বাস্তবায়ন করছিলো তখন অন্যদিকে '৭২-পরবর্তী প্রতিবছরেই প্রতিরক্ষা খাতে বাজেট বরাদ্ধ হ্রাস পেতে শুরু করেছিল। এ প্রক্রিয়ায় ১৯৭৩ সালে প্রতিরক্ষা বাজেট পূর্ববর্তী বছরের চেয়ে ৩৪ মিলিয়ন ডলার থেকে হ্রাস পেয়ে মাত্র ১৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলারে এসে দাঁড়ায় এবং '৭৪-'৭৫ সালে তা আরো হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়ে ছিল মাত্র ৭৫০ মিলিয়ন টাকায়। এটাই ছিল আওয়ামী লীগের জাতীয় সেনাবাহিনীর আধুনিকায়নের দৃষ্টান্ত।এদিকে প্রতিরক্ষা খাতে অপ্রতুল ব্যয় বরাদ্ধ ও ভারতে অস্ত্র 'স্থানান্তরের' ঘটনা যখন ঘটছিল তখন আ'লীগ সরকার ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়াসহ কম্যুনিষ্ট ব্লকের ক'টি দেশ থেকে অল্প বিস্তর অস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগ নেয়। অবশ্য এসব অস্ত্রশস্ত্রের বেশির ভাগই এসেছিল বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে যার প্রায়গুলিই ছিল 'অকেজো প্রায়' মান্ধাতার আমলের। বিভিন্ন তথ্যসূত্র থেকে '৭২-'৭৫ পর্যন্ত আ'লীগ সরকারের সংগৃহীত সমরাস্ত্রের বিবরণ থেকে নিম্নলিখিত তথ্যাদি পাওয়া যায়। যথাঃ

বাংলাদেশে অস্ত্র সংগ্রহ ('৭১-'৭৫)

সরবরাহকারী দেশ	অর্ডার সংখ্যা	অস্ত্রের ডিজাইন	অর্ডার বছর	সরবরাহের বছর	সরবরাহ কৃত	মন্তব্য
ভারত	০৩	এএন-১২ পরিবহন বিমান	১৯৭১	১৯৭২	০৩	প্রায় বাতিলযোগ্য
ভারত	০৪	ডিএইচসি-৩ অটার বিমান	১৯৭১	১৯৭১	০৪	প্রায় বাতিলযোগ্য
ভারত	০১	ডিএইচসি-৪ বিমান	১৯৭১	১৯৭১	০১	প্রায় বাতিলযোগ্য
ভারত	০৪	চেতাক হেলিকপ্টার	১৯৭২	১৯৭৩	০৪	প্রায় বাতিলযোগ্য
ভারত	(৩০)	১০৫ মিমি কামান	১৯৭১	১৯৭১	(৩০)	সরবরাহ নিশ্চিত নয়
ভারত	০২	অভয় শ্রেনীর নৌযান	১৯৭২	১৯৭২-৭৩	০২	
ইংল্যান্ড	০২	ওয়েসেক্স হেলিকপ্টার	১৯৭৩	১৯৭৩	০২	
রাশিয়া	০১	এএন-২৪ পরিবহন বিমান	১৯৭২	১৯৭৩	০১	পুরানো
রাশিয়া	০৬	এম আই ৮হেলিকপ্টার	১৯৭৩	১৯৭৪	০৬	পুরানো
রাশিয়া	১০	মিগ-২১ এমএফ	১৯৭৩	১৯৭৪	১০	পুরানো
রাশিয়া	০২	মিগ-২১ ইউটিআই	১৯৭২	১৯৭৩	০২	পুরানো
রাশিয়া	০১	ইয়াক-৪০পরিবহন বিমান	১৯৭২	১৯৭৩	০১	পুরানো
রাশিয়া	(১৫)	টি-৫৪ ট্যাংক	১৯৭৩	১৯৭৪	(১৫)	সরবরাহ নিশ্চিত নয়

তথ্যসূত্রঃ Michael Brzoska and Thomas Ohlson, Arms Transfer to the Thirld World, 1971-1985 (New Yourk, Oxford University Press, 1987) P.P 148-149; SIPRI Year Book 1990 (London, Taylor and Francis 1990)]

উপরোক্ত সমরাস্ত্র সংগ্রহ ছাড়াও ভারত থেকে মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রাপ্ত SLR বা Self Loading Rifle সহ অন্যান্য অস্ত্র সেনা সদস্যদের চেয়ে রক্ষীবাহিনীই বেশি পেয়েছিল বলে জানা যায়। সে সময় সশস্ত্র বাহিনীর চেয়ে "প্রচুর টাকা খরচ করা হতো রক্ষীবাহিনীর ব্যারাক তৈরী করার জন্য। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বেশিরভাগই পেত রক্ষীবাহিনী। আর সেনাবাহিনীকে সন্তুষ্ট থাকতে হতো সেকেলে অস্ত্রপাতি নিয়ে। রক্ষীবাহিনীকেই আধুনিক স্বয়ংক্রীয় রাইফেল-এ সজ্জিত করার আলাপ-আলোচনা চলছিল। অথচ সেনাবাহিনীর হাতে পুরানো ৩০৩ রাইফেলের বেশি কিছু ছিল না।"
(মুজিব নিজেই দায়ী-মার্টিন উলাকট, লন্ডন গার্ডিয়ান ১৬/৮/৭৫ সংখ্যা)

এদিকে সত্য নেই কিন্তু যা ইচ্ছে তা বলা বরাবরই আ'লীগের স্বভাব। বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনী নিয়েও এমন অনকে কথা বলেছেন আওয়ামী নেতৃবৃন্দ। এবং এসব ক্ষেত্রে সশস্ত্রবাহিনীতে যাবতীয় অঘটন সৃষ্ঠির জন্য এককভাবে দায়ী করেছেন (অবশ্যম্ভাবীরূপে) বিএনপি'কে। এমনকি সশস্ত্রবাহিনীর বিভিন্ন গ্যারিসনে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীতে যাবতীয় ক্যু' ও বিভেদ সৃষ্টির জন্য বিএনপি'র প্রতিষ্ঠাতা জে. জিয়াকে দোষারোপ করেছেন। সশস্ত্রবাহিনীর মতো একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে রাজনৈতিক কথা বলা যায় কিনা সে প্রসঙ্গ ভিন্ন তবে শেখ হাসিনার অভিযোগের সত্যতা কতটুকু তা অন্তত আমরা তলিয়ে দেখতে পারি।

গ। সামরিক অভ্যূত্থান ও সশস্ত্রবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি

'৭৫-এর পটপরিবর্তনের পর থেকে শুরু করে '৯৬-এ আ'লীগের দ্বিতীয়বার ক্ষমতারোহনের পূর্ব পর্যন্ত সশস্ত্রবাহিনীতে 'পরিকল্পিতভাবে সৃষ্টি করা হয় বিভক্তি, অন্ত র্দ্বন্দ্ব, ভ্রাতৃঘাতি সংঘর্ষ' - এ অভিযোগ করেছেন শেখ হাসিনা। বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের ঘাড়ে সকল দায় দায়িত্ব চাপিয়ে দিয়ে শেখ হাসিনা ১৭টি ক্যু ও সহস্রাধিক সেনা সদস্যের 'বিনাদোষে' বিচারের কথা যেমন বলেছেন তেমনি ২২তম বেঙ্গল রেজিমেন্ট বিলুপ্তির মাধ্যমে জিয়া যে সেনা বাহিনীকেই আসলে ধ্বংস করতে চেয়েছিলেন সে অভিযোগও করেছেন আওয়ামী লীগ সভানেত্রী। '৭৫ এর ১৫ আগষ্ট পরবর্তী বাংলাদেশে কারা সামরিক অভ্যূত্থান ঘটিয়েছে? এ প্রশ্নের উত্তর ইতিহাসের পাঠক মাত্রেরই জানা। ১৯৭৫ সালের ৩রা নভেম্বর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে। প্রকৃত অর্থে সেদিনই সেনাবাহিনীকে একটি ইন্সটিটিউশন হিসেবে অভ্যুত্থান প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করা হয়। সেনাবাহিনীর তদানীন্তন সিজিএস বা চীফ অফ জেনারেল স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ছিলেন সেই ক্যু'দেতার উদ্যোক্তা। পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যাদি থেকে বলা যায় খালেদ মোশাররফ ছিলেন প্রো-আওয়ামী লীগার। তাঁর ক্ষমতারোহনের পর তাঁর ভাই ও মা 'বঙ্গবন্ধু' হত্যাকান্ডের বিরুদ্ধে 'জয়বাংলা' 'জয় বঙ্গবন্ধু' ধ্বনি সহকারে ঢাকার রাস্তায় মিছিল করেছিলেন। শেখ হাসিনা সরকারেও তার ভাই আ'লীগের একজন এম.পি এবং মন্ত্রী। এছাড়াও খালেদ

মোশাররফের ক্ষমতা দখলকে সমর্থন করে এদেশে যেমন আওয়ামী মহল থেকে সোৎ-সাহ অভিনন্দন জানানো হয়েছিলো তেমনি সে সময় ভারতীয় 'আকাশবাণীতে'ও সানন্দে সেই অভ্যুত্থানকে স্বাগত জানানো হয় প্রকাশ্যেই। এমনকি "৩ নভেম্বর প্রতিক্রিয়াশীল সামরিক অভ্যুত্থানের পর অভ্যুত্থানকারীরা সম্ভাব্য যে কোন পাল্টা অভ্যুত্থানের মোকাবিলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে আমন্ত্রণ জানানোর উদ্যোগ নিয়েছিলেন।" **(তথ্যসূত্রঃ ফিনান্সিয়াল টাইমস, লন্ডন, ১০ নভেম্বর ১৯৭৫ সংখ্যা)**

মূলত কিছু কিছু আ'লীগ সমর্থক ও নিঃসন্দেহে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বাংলাদেশে আমন্ত্রক সেনা সদস্যই বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে বার বার গোলযোগ সৃষ্টি করেছে যার ফলশ্রুতিতে সংঘটিত হয়েছে একটির পর একটি ক্যু বা সেনা অভ্যুত্থান। অন্যদিকে '৭৫ -এর ১৫ আগস্ট যে ঘটনায় শেখ মুজিবুর রহমান মর্মান্তিকভাবে নিহত হন সে 'চক্রান্তে' সামরিক বাহিনীর ক'জন মাঝারি পর্যায়ের অফিসার জড়িত থাকলেও প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেনাবাহিনী মোটেও জড়িত ছিল না। এছাড়া ঐ হত্যাকান্ডের পর সামরিক বাহিনী ক্ষমতা গ্রহণ না করায় এতে কোনভাবেই পুরো সামরিক বাহিনীকে দায়ী করা যায় না। এরপরও যদি আওয়ামী মহল এ ঘটনাকে সামরিক অভ্যুত্থান বলতে চান তাহলে সঙ্গতকারণেই তাদের প্রশ্ন করতে হবে- ১৫ আগস্ট '৭৫ এর পর বাংলাদেশের ক্ষমতায় ছিল কারা? নিশ্চয়ই আওয়ামী লীগ। তাহলে ব্যাপারটি কি দাড়াচ্ছে? আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় থাকতেই তাদের দাবীমতে মুজিব নিহত হলেন তাঁরই অধিনায়কত্বে পারিচালিত সেনাবাহিনীর কতিপয় সদস্যের হাতে? এটা কি আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা? যদি প্রেসিডেন্ট জিয়ার শাসনামলে সংঘটিত ক্যু'দেতার জন্য শেখ হাসিনা জিয়াকে দায়ী করতে চান, তাহলে আওয়ামী লীগ শাসনামলে সংঘটিত অভ্যুত্থানের জন্য কি আওয়ামী লীগকে দায়ী করা অন্যায় কিছু হবে? এদিকে বলা হচ্ছে '৭৫ পরবর্তী সরকারগুলিই সশস্ত্রবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি করেছে ও বিনাবিচারে শত শত সেনা সদস্যকে চাকুরীচ্যুত করেছে। এ প্রসঙ্গে প্রথমেই বলা যায় সশস্ত্র বাহিনী সিভিল আইনের আওতায় থাকা কোন প্রতিষ্ঠান নয় বরং সামরিক বাহিনী পরিচালিত হয়ে থাকে একটি কঠোর সামরিক আইনের আওতায়। বেসামরিক সরকারী চাকুরীতে একজন পিয়ন সচিব পদমর্যাদার কারো আদেশ অমান্য করলেও তার চাকুরী হয়ত সিভিল আইন বলে নাও যেতে পারে; কিন্তু সামরিক বাহিনীতে একই পদমর্যাদার কর্মকর্তাদের মধ্যে সিনিয়রের ন্যূনতম একটি আদেশ অমান্যের শাস্তি ভয়ঙ্কর। সেনা আইনকে ক্ষেত্রবিশেষে কঠোর মনে হতে পারে। কিন্তু ঐরূপ আইন পৃথিবীর সকল সশস্ত্রবাহিনীতেই রয়েছে। এখানে দরদ দেখিয়ে 'মামা বাড়ির আবদার' করার কোন সুযোগ নেই। কোন অপরাধ সংঘটনের পর যদি 'দরদ' দেখিয়ে প্রাপ্য শাস্তি মওকুফ করে দরদ দেখানোর 'মহান উদ্দেশ্য' হাসিলের চেষ্টা করা হয় তাহলে আর সেটি সেনা প্রতিষ্ঠান হিসেবে টিকতে পারে না। তাই সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের আশায় বা সেনাবাহিনীকে নিয়ে রাজনীতি করার ইচ্ছে থেকেই আ'লীগ সভানেত্রী পরোক্ষভাবে হলেও বাহবা পেতে চান, বা সেনাবাহিনীর 'শৃংখলা' নষ্ট করতে চান কিনা সেটিই তলিয়ে দেখা দরকার। উল্লেখ্য যে প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যাকাণ্ডের আসামীদের পূর্ণ বিচারে প্রাপ্ত সাজা মওকুফ করে দেয়ার জন্য যারা এক কথায় হৈ চৈ করেছিল তারাই পরবর্তীকালে শেখ মুজিব হত্যাকাণ্ডের এ টু জেড সকল আসামীর

মৃত্যুদণ্ড কামনা করছেন। কি অদ্ভুত দ্বিমুখী নীতি! কারন, প্রেসিডেন্ট জিয়ার হত্যাকারীদের মুক্তিযোদ্ধা এই যুক্তিতে মুক্তি দাবী করা হলে কর্নেল ফারুক, রশীদ, হুদা, ডালিম, নূর প্রমুখ মুক্তিযোদ্ধার শাস্তির দাবী তোলা হচ্ছে কেন? নাকি যে ক্যু'দেতা আওয়ামী লীগের পক্ষে যায় সেই অভ্যুত্থানকারীদের মাফ করে দিতে হবে; আর যেটি তাদের বিপক্ষে গেছে সেটিই 'বিদ্রোহ'।

আসলে আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান, বিভেদ সৃষ্টিকারী ঘটনার প্রথম উদ্যোক্তা কে বা কারা? এক্ষেত্রে নিমর্ম ইতিহাস এই সাক্ষী দেয় যে, মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় গড়া সেনাবাহিনীর মতো একটি গর্বিত সংগঠন থাকার পরও স্বাধীনতা পরবর্তী আ'লীগ সরকার রক্ষীবাহিনীর ন্যায় একটি ভিন্ন কিন্তু সমান্তরাল এলিট সশস্ত্র সংগঠন গড়ে তুলেছিল। এতেই কি সশস্ত্রবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির বীজ বপন করা হয়নি? এর পরও সেনাবাহিনীতে ভাঙ্গন ধরানোর জন্য অনেক কিছুই করেছেন তদানীন্তন আওয়ামী সরকার। তাই একজন বীর উত্তম জেনারেল মঞ্জুর এক পর্যায়ে বলতে বাধ্য হয়েছিলেন 'সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়ার জন্য মুজিব সকল পন্থাই ব্যবহার করেছিলেন। তিনি কাউকে তাঁর জীবনের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়াতে পারে এমন সন্দেহ হলেই সেখানে ভাঙ্গন ধরিয়ে দিতেন। একমাত্র মুজিবই সেনাবাহিনীতে ভাঙ্গন ধরিয়ে একে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিলেন।' **(বাংলাদেশ এ লিগেসী অব ব্লাড, এন্থনী ম্যাসকারানহাস, অধ্যায়-৪)**

এছাড়া '৭২ থেকে '৭৫ পর্যন্ত এই আওয়ামী লীগ আমলেই বিনা বিচারে শুধুমাত্র 'এক নেতার' মুখের কথায় বহু মেধাবী মুক্তিযোদ্ধা অফিসারকে চাকরী থেকে বরখাস্তের ঘটনা ঘটেছে ধারাবাহিকভাবে। স্বাধীন বাংলাদেশে এই আ'লীগ সরকারই একমাত্র সরকার যারা বিজয়ের মাস ঘুরতে না ঘুরতেই একজন সেক্টর কমান্ডার মেজর জলিলকে চাকরীচ্যুত করেন। সেদিন মুক্তিযুদ্ধের সেক্টর কমান্ডার হওয়ার পরও মেজর জলিলের অপরাধ প্রমাণের জন্য নিরপেক্ষ কোন বিচার কি হয়েছিল? হয়নি। যেমন হয়নি অন্য আরো একাধিক মুক্তিযোদ্ধার ক্ষেত্রে। এ ব্যাপারে বহু গবেষক ও প্রত্যক্ষদর্শীর অনেক বিরবণ পাওয়া যায়। এদেরই একজন লে. কর্নেল এম এ হামিদ। তার বক্তব্য থেকেই '৭২-'৭৫ এর সশস্ত্রবাহিনীতে 'অবাধ' চুকরীচ্যুতি ও তদানীন্তন সরকারের সেনাবাহিনী বিরোধী কার্যকলাপ সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর বর্ণনা মতে, 'উত্তপ্ত ঢাকা সেনানিবাস। বেশ ক'টি বিচ্ছিন্ন ঘটনাও ঘটে গেল একের পর এক। গাজী গোলাম মোস্তফার ছেলে কর্তৃক মেজর ডালিম লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য। বিয়ের পার্টিতে উপস্থি'ত বর নব বিবাহিত ডালিম ও তার স্ত্রী। গাজীর ছেলে ডালিমকে অপমান করে। এ নিয়ে কথা কাটাকাটি। ...... কিছুক্ষণের মধ্যে গাজীর ছেলে দলবল নিয়ে হাজির। ডালিমও স্ত্রীকে একটি গাড়িতে উঠিয়ে অজ্ঞাত স্থানে যাত্রা। ক্যান্টনমেন্টে খবর শুনে ডালিমের বন্ধু মেজর নুর এক গাড়ি সৈন্য নিয়ে গাজী গোলাম মোস্তফার বাড়ি ঘেরাও এবং ডালিমকে ফেরত দেয়ার দাবী। তাকে বঙ্গবন্ধুর সামনে হাজির করা হলো। ডালিমের ফরিয়াদ, 'বঙ্গবন্ধু' আমরা যখন লড়াই করেছি এই ছেলেরা তখন ফুর্তি করেছে। আজ তারা আমাকে অপমান করেছে। আপনি বিচার করুন। শার্ট খুলে সে দেখায় পিঠে আঘাত। বঙ্গবন্ধু বিচার করলেন! তিনি সেনা শৃংখলা ভঙ্গের দায়ে মেজর ডালিম ও মেজর নুরকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করলেন। এসব নিয়ে ক্যান্টমেন্টে দারূণ

উত্তেজনা। সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ এই দুই তরুণ অফিসারকে বরখাস্ত না করার পক্ষে জোর সুপারিশ করলেও শেখ সাহেব তা প্রত্যাহার করতে অস্বীকার করেন। ঘটনাটি ক্ষুদ্র হলেও এর প্রতিক্রিয়া ছিল সুদূর প্রসারী।

ঐসময় বিভিন্ন কারণে আরো কিছু অফিসার বহিস্কৃত হলো। কর্নেল জিয়াউদ্দিন ইতোপূর্বেই একটি পত্রিকায় সরকারের তীব্র সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখার অজুহাতে বহিস্কৃত। কর্নেল তাহেরকে পঙ্গু হওয়ার অজুহাতে অবসর দেওয়া হয়। বীর মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলকে তিন বছর আগেই বহিস্কার করা হয়েছে। ভারতীয় সেনা বাহিনীর সদস্যরা মালামাল লুট করে দেশে নিয়ে যাওয়ার সময় জোর প্রতিবাদ জানালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পরে অসম্মানজনকভাবে সেনাবাহিনী থেকে বের করে দেয়া হয়।' **(তিনটি সেনা অভ্যুত্থান ও কিছু না বলা কথাঃ লে. কর্নেল (অব.) এম.এ. হামিদ পি,এস,সি, পৃঃ ৯-১০)** এর পাশাপাশি অনেক সিনিয়র ও যোগ্য সেনা কর্মকর্তাকে সে সময় শুধুমাত্র পাকিস্তান প্রত্যাগত হওয়ার কথিত অপরাধে বিনা কারনে অবসর দেয়া হয়। এদের মাঝে লে. জে. খাজা ওয়াসিউদ্দিন, মে. জে. করিমসহ আরো অনেক অফিসারের নাম উল্লেখ করা যায়। এখন এসব তথ্য প্রমান উপস্থাপনের পর কি একতরফাভাবে বলা যাবে, শেখ হাসিনা সেনাবাহিনীতে বিভেদ সৃষ্টি ও বিনা বিচারে সেনা সদস্যের চাকরিচ্যুতির জন্য '৭৫ পরবর্তী সরকারসমূহকে যেভাবে অভিযুক্ত করেছেন তা আদৌ যুক্তিসঙ্গত ও সম্পুর্ণ তথ্যভিত্তিক? যেখানে তদানীন্তন আওয়ামী লীগ সরকার কর্নেল জিয়াউদ্দিন, কর্নেল তাহের, মেজর জলিল, ডালিম, পাশা, হুদা'র মতো মুক্তিযোদ্ধা অফিসারদের মুক্তিযুদ্ধের অপার কৃতিত্ব প্রদর্শনের রেকর্ড থাকার পরও বিনা বিচারে চাকুরী থেকে বহিস্কার করেছিলেন সেখানে তারা আজ কোনভাবেই সেনাবাহিনী সম্পর্কে বহিস্কার নাটকের অবতারণা করতে পারেন না।

এবার দেখা যাক, প্রসিডেন্ট জিয়ার শাসনামলে যেসব ক্যু বা সামরিক অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়েছে সেসবের জন্য দায়ী কে এবং এখানে জেনারেল জিয়ার ভুমিকা বা করণীয় কি ছিল?

এক্ষেত্রে প্রথমেই বিচার করতে হবে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট এর অব্যবহিত পর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সাংগঠনিক ভিত্তি ও সার্বিক অবকাঠামো কিরূপ ছিল। সে সময় ১৫ আগস্ট হত্যাকান্ডের পর পুরো রক্ষীবাহিনীকে সশস্ত্রবাহিনীতে আত্মীকরণ করা হয়। এক্ষেত্রে দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া বিশেষ কোন যাচাই বাছাই করা হয়নি। ফলে সামরিক বাহিনীর অবকাঠামোয় লীন হলেও রক্ষীবাহিনীর কিছু কিছু অংশ কখনোই শেখ মুজিব হত্যাকান্ডে কতিপয় সেনাসদস্যদের জড়িত থাকার অপরাধ মানসিকভাবে ক্ষমা করে দিতে পারেনি। এব্যাপারে তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি এদের অনুকুলে না থাকায় এরা প্রকাশ্যে কিছু বলতে না পারলেও মানসিক পর্যায়ে সে বেদনা বহন করেছে পরবর্তী সুযোগের প্রত্যাশায়।

একথা সত্যি ঢালাওভাবে সকল রক্ষীবাহিনী সদস্যকে প্রো-আওয়ামীগ বলার কোন ভিত্তি নেই কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে রক্ষীবাহিনী যে ভারতীয় প্রশিক্ষকদের তত্ত্বাবধানে আ'লীগের ছায়া সশস্ত্র সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠেছিল তা বলাই বাহুল্য। রক্ষীবাহিনীর এই মানসিক, আদর্শিক অবস্থান এক পর্যায়ে ৭ নভেম্বর '৭৫ পরবর্তী বিরাজিত বিশৃংখল পরিবেশের সাথে 'মিলেমিশে' এক জটিল পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

বলতে গেলে এ দু'টো জটিলতাই '৭৫ পরবর্তী সেনাবাহিনীতে একটির পর একটি 'আদর্শিক ভিন্নতা হেতু' অভ্যুত্থান প্রয়াসে ইন্ধন জোগায়।

তবে এ দু'টো জটিলতার মাঝে আবার তৃতীয় একটি পক্ষের কলকাঠি নড়াচাড়াও ছিল অনেক অনাসৃষ্টির মৌলিক ভিত্তি। আওয়ামী লীগের ক্ষমতাচ্যুতিতে ক্ষুব্ধ এই তৃতীয় শক্তিটি '৭৫ পরবর্তী সকল জাতীয়তাবাদী সরকারের শাসনামলে সশস্ত্রবাহিনীতে একটির পর একটি চক্রান্ত সংগঠিত করেছে। নিঃসন্দেহে এই তৃতীয় পক্ষটি হচ্ছে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'।

'৭৫-এর আকস্মিক পট পরিবর্তনে এরা একদিকে যেমন চরম হতাশ হয়ে পড়ে তেমনি প্রতিশোধ গ্রহনেও এ সংস্থাটি প্রণয়ন করে চলছিল ভয়াবহ সব পরিকল্পনা। সে সময় বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে যেসব অভ্যুত্থান সংঘটিত হয় তারও মূল পরিকল্পক ছিল-'র'। এদের উদেশ্য ছিল সামরিক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে যেনতেন উপায়ে জেনারেল জিয়াকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করা ও একজন বশংবদ সেনাকর্মকর্তাকে আপাত মতায় বসানো যাতে আ'লীগের হারানো ভিত্তি পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করা যায়। এদের এই চক্রান্ত সম্পর্কে ভারতের সাপ্তাহিক 'সানডে' পত্রিকার ১৮তম সংখ্যায় ১৯৮৪ সালে 'দি সেকেন্ড ওল্ডেস্ট প্রফেশন' শিরোনামে এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। সানডে'র এই তথ্য হতে জানা যায়, '৭৫ সালের পর ইন্দিরা গান্ধির অনুমোদন নিয়ে 'র' বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যা করার চক্রান্ত বাস্তবায়নে অগ্রসর হয়। কিন্তু '৭৭ সালের ভারতে জনতা পার্টি নির্বাচনে জয়ী হলে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে 'র'-এর প্রথম দফা হত্যার প্রচেষ্টা ভন্ডুল হয়ে যায়। যদিও '৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী নির্বাচনে বিজয়ী হবার পর পুনরায় মাঠ পর্যায়ে 'র' এগিয়ে যায় এবং জিয়াকে হত্যা করে। এখানে সকলেই জানেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একটি অংশ জিয়াকে হত্যা করেছিল। তাহলে কি একথা বলা যায় না যে, 'র' বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অভ্যুত্থান প্রচেষ্টার সাথে জড়িত ছিল? এদিকে এ ব্যাপারে আরো ইঙ্গিত পাওয়া যায় ঐ একই ভারতীয় পত্রিকায়। তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ জনতা দলীয় এমপি সুব্রামনিয়াম স্বামীকে উদ্ধৃত করে নিবন্ধে বলা হয় 'র' এর তৎকালীন প্রধান কাশ্মীরী ব্রাক্ষ্মণ আর এন কাও ও সহকারী প্রধান শঙ্কর নায়ার মুজিবের মৃত্যুতে ভেঙ্গে পড়েন এবং জিয়া হত্যার চক্রান্ত করেন। কংগ্রেস সরকারের পতনের পর মোরারজী দেশাইকে বিষয়টি অবহিত করা হয়। প্রতিবেশী একটি দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে হত্যায় 'র'-এর আকাংখা শুনে প্রধানমন্ত্রী দেশাই বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তিনি জিয়া হত্যা চক্রান্ত বন্ধের নির্দেশ দেন। শঙ্কর নায়ার তখন বলেন, এ অবস্থায় ফিরে আসার পথ রূদ্ধ হয়ে পরিত্যক্ত হলে 'র' এর 'সদস্যরা' (এজেন্ট) বিপদাপন্ন হয়ে পড়বে।

এখানে শঙ্কর নায়ার যেসব 'র'-এর এজেন্ট বিপদাপন্ন হওয়ার কথা বলেছিলেন তারা (এজেন্ট) কিন্তু মোরারজী দেশাইয়ের অপারেশন স্থগিত করার আদেশে ঠিকই 'বিপদে' পড়েছিলেন। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বহু অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত চক্রান্তকারী 'র' যে সেনাবাহিনীতে কর্মরত ব্যক্তিদেরই জিয়া হত্যার এজেন্ট হিসেবে নিয়োগ করেছিল তাও প্রমাণিত হয়েছে জিয়া হত্যাকান্ড ও পরবর্তীতে এরশাদের ক্ষমতারোহণে। এখানে প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করতে হয়, যখন কোন গুপ্তচরবৃত্তি

সম্পর্কিত মিশন মাঝপথে বন্ধ করে দেয়া হয় তখন অবধারিতভাবে নিয়োগকৃত এজেন্টরা হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে, ধরা পড়ে ও ক্ষেত্র বিশেষে উপায়ন্তর না দেখে মরণকামড় বসানোর চেষ্টা করে। প্রেসিডেন্ট জিয়ার আমলে '৭৭-'৮০ পর্যন্ত ভারতে মোরারজী দেশাই ও জনতা দল ক্ষমতায় ছিল বলেই বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে রোপিত 'র' এজেন্টরা হতবুদ্ধি হয়ে অনেক বিক্ষিপ্ত অভ্যুত্থান ঘটিয়েছিল।

এদিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে সশস্ত্রবাহিনীতে মোটামুটি চারটি ধারা বিদ্যমান ছিল। এর একটি হচ্ছে কর্ণেল ফারুক রশীদদের সমর্থক অংশ, একটি বিপ্লবী গণবাহিনীর সদস্যবৃন্দ সমন্বয়ে গঠিত চক্র, সরকার সমর্থক মূল অংশ ও অপরটি 'র' প্রভাবিত-প্ররোচিত গোপন চক্রান্তকারী দল। অবশ্য বিপ্লবী গণবাহিনীর সদস্যদের অস্থিশীল ও উগ্র মন মানসিকতার কারণে সেই গ্রুপেও 'র' আড়াল থেকে উস্কানী প্রদানে সক্ষম হয়েছে।

উপরোক্ত গ্রুপগুলি '৭৫ থেকে '৮০ পর্যন্ত অস্থির পরিস্থিতির সুযোগে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীতে সর্বমোট ১৭টি অভ্যুত্থান সংগঠিত করে। এছাড়া আরো বহু ছোটখাট ক্যু'দেতা তো হর হামেশাই সংঘটিত হয়েছে। বলতে গেলে '৭৫ এর পট পরিবর্তনের পর হঠাৎ আকারে বেড়ে ওঠা সশস্ত্রবাহিনীতে তখন কেবল রি-অর্গানাইজেশনের কাজ শুরু হয়েছে। এর উপর পর পর দু'টো ঘটনা অর্থাৎ ১৫ আগস্টের নির্মম হত্যাকান্ড ও ৭ নভেম্বরের বিপ্লব সংঘটিত হওয়ায় সশস্ত্র বাহিনীর সার্বিক শৃংখলার মানে বেশ অধোগতি পরিলতি হয়। বিশেষ করে ৭ নভেম্বরের বিপ্লবে গণবাহিনী তাদের শ্রেনীবিহীন সেনাবাহিনী গড়ায় ব্যর্থ হওয়ায় যেভাবে উগ্র মূর্তি ধারণ করেছিল তা এক কথায় ভয়াবহ। তথাকথিত গণবাহিনী গঠনের ইউটোপিয়ান ধারণায় 'মোহিত' এসব বিপ্লবী গণবাহিনীর সদস্য সে সময় শুধুমাত্র নভেম্বর '৭৫ মাসেই প্রায় ৬০ জন সেনা অফিসারকে হত্যা করে। **(লরেন্স লিফসুলৎস ঃ বাংলাদেশ দি আনফিনিশড রেভ্যুলেশন, পৃ. ৮৯-৯৬)**। এর বাইরেও পরবর্তীতে বিপ্লবী গণবাহিনীর সদস্যরা রাজনৈতিক প্ররোচনায় আরো অভ্যুত্থান সংঘটনের প্রয়াস চালায়। এগুলোর মধ্যে ১৯৭৭ সালের ২ অক্টোবর বিমান বাহিনীর কতিপয় নন কমিশনড সেনা কর্তৃক সংঘটিত অভ্যুত্থানের উল্লেখ করা যায়। এঘটনায় বিপ্লবী গণবাহিনীর সদস্যরা যাদের মাঝে পরবর্তীতে যোগ দেয়া সেনা সদস্যরাও ছিলেন তারা ঢাকা বিমান বন্দরে আক্রমণ চালিয়ে প্রায় ২০০ জনকে হত্যা করে যার মাঝে বিমান বাহিনীর ১১ জন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাও ছিলেন। এদের হত্যা করায় বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তৎক্ষনাৎ এর উড্ডয়ণ ক্ষমতা (প্রায়) হারিয়ে ফেলে। এসব উচ্ছৃংখল সৈন্য প্রায় ৭০টি আর্মি ও ২৫টি বিমান বাহিনীর ট্রাক নিয়ে বিদ্রোহে অংশ নেয় ও কেন্দ্রীয় অর্ডন্যান্স (সমরাস্ত্র) ডিপো লুট করে। এরা এক পর্যায়ে রেডিও স্টেশনও দখল করে নেয়। এদের উদ্দেশ্য ছিল জেনারেল জিয়াকে হত্যা করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা ও অতি অবশ্যই অফিসারবিহীন সেনাবাহিনী গড়ে তোলা। এতে স্পষ্টতই বোঝা যায়, যদি এরা সফল হতো তাহলে বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীর প্রায় সকল অফিসারই হয় নিহত হতেন নতুবা পালিয়ে যেতেন প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে।

এদিকে এই অভ্যুত্থান ঘটার মাত্র ২/৩ দিন পূর্বে বগুড়া সেনানিবাসে অনুরূপ আরেকটি অভ্যুত্থানের ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় বাগুড়াস্থ ২২ ইস্ট বেঙ্গলের সৈনিকরা

বিপ্লবী গণবাহিনীর নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করে ও দু'জন নবীন লেফটেন্যান্টকে হত্যা করে এবং কয়েকজন অফিসার এদের হাতে আটক হয়। ২৯/৩০ সেপ্টেম্বর '৭৭ তারিখে বগুড়ায় যখন এ ঘটনা ঘটে চলছিল ঠিক একই সাথে ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট ও যশোর ক্যান্টনমেন্টেও অনুরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করা হয়। এসব ঘটনায় ভারতের ঐ বিশেষ সংস্থাটির যোগসাজশ ছিল বলে পরবর্তীতে জানা যায়।

উপরোক্ত দু'টো অভ্যুত্থান প্রচেষ্টা অন্যান্য অভ্যুথানের ন্যায় সরকার সমর্থক সেনা সদস্যদের আন্তরিক সহযোগিতার কারনে সফল হতে পারেনি। এসব ঘটনায় যেমন শত শত সেনা সদস্য জড়িত ছিল, ক্যু ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ঠিক তেমনি শত শত সেনা সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়। কোর্ট মার্শালে এদের সঙ্গত কারনেই কঠোর শাস্তি প্রদান করা হয়। এধরনের ঘটনা যারা ঘটিয়েছিল তাদের বিচারের কারণে আজ যারা উষ্মা প্রকাশ করছেন তারা কি এটাই বলতে চান যে, উচ্ছৃংখল বিমান সেনা কর্তৃক ২০০ জন মানুষ হত্যা সঠিক ছিল? বা ২২ ইস্ট বেঙ্গলের যে সৈনিকরা অফিসার হত্যা করেছিল তার ক্ষমাযোগ্য অপরাধ? এসব মিউটিনিকে যদি মেনে নেয়া হতো বা বিদ্রোহীদের উপযুক্ত বিচার করা না হতো, তাহলে আজ কোথায় থাকতো বর্তমান সুশৃংখল সেনাবাহিনীর অবকাঠামো? আসলে এধরনের অপরাধীদের জিয়া কেন- পৃথিবীর কারো পক্ষেই ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখার উপায় ছিল না। আওয়ামী লীগের কেউ ক্ষমতায় থাকলেও তা পারতেন না। আসলে দ্বিমুখীনতাই আওয়ামী লীগের মূল চরিত্র। এটা তাদের স্বভাবজাত; তাই জিয়া কর্তৃক ২২ ইস্ট বেঙ্গল ভেঙ্গে দেয়ার কথা বললেও অপর একটি রেজিমেন্ট বেঙ্গল ল্যান্সার ভেঙ্গে দেয়ার ঘটনা তারা সম্পূর্ণ চেপে যান। অথচ ২২ বেঙ্গল বেজিমেন্টকে যেমন রেজিমেন্টগতভাবে অভ্যুত্থান করার দায়ে ডিসব্যান্ড করা হয়, তেমনি ঐ একইরূপ কারণে বগুড়াস্থ বেঙ্গল ল্যান্সারকে সে সময় ভেঙ্গে দেয়া হয়। প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক যে, শেখ হাসিনা কেন এ ঘটনার উল্লেখ করলেন না? এর উত্তরে বলা যায় ১৯৭৬ সালের মে মাসের প্রথম দিকে মুজিব হত্যাকান্ডে জড়িত তদনিন্তন কর্নেল ফারুক একসময় তার অধিনায়কত্বে পরিচালিত ট্যাঙ্ক রেজিমেন্ট 'বেঙ্গল ল্যান্সার'-এ আকস্মিকভাবে উপস্থিত হন। তিনি তাঁর পুরানো ইউনিট ও প্রায় ৩০টি ট্যাঙ্ক হাতে পেয়ে পুনরায় ক্ষমতা দখলের স্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেন এবং উক্ত রেজিমেন্টকে ঢাকায় স্থানান্তরের দাবী জানিয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু বগুড়া সেনানিবাসের অপরাপর রেজিমেন্টের মাধ্যমে জে. জিয়া পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন ও 'বেঙ্গল ল্যান্সার'কে অবলুপ্ত ঘোষণা করে এর প্রায় ৫০০ অফিসার ও জোয়ানদেরও বন্দী করে ফেলেন। সমালোচনাকারীদের মতে জিয়া নাকি সেনা ইউনিট বিলুপ্ত করে সেনাবাহিনীর অঙ্গহানি ঘটান! কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে মারাত্মক কোন ডিসগ্রেসফুল কর্মকান্ডে জড়িত থাকার অপরাধে সরকার কর্তৃক কোন ইউনিট ভেঙ্গে দেয়ার অর্থ এই নয় যে তাতে সেনাবাহিনীর সার্বিক অকল্যাণ করা হলো। যেমন বেঙ্গল ল্যান্সার ভেঙ্গে দেয়া হলেও এর ৩০টি ট্যাঙ্ককে কি জে. জিয়া ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করেছিলেন? না বরং এই ট্যাঙ্কগুলো দিয়েই 'ফোর হর্স' নামে অপর একটি রেজিমেন্ট গঠন করা হয়েছিল। এখানে শুধুমাত্র দোষি সৈনিক-অফিসারদের বদলে নেয়া হয়েছিল নতুন সেনা সদস্যদের। এই ছিল পার্থক্য।

এভাবে শেখ হাসিনা '৭৫ পরবর্তী সরকারের শাসনামলে অসংখ্য সামরিক

অভ্যুত্থান হওয়ার অভিযোগ উত্থাপন করলেও কোন এক অজ্ঞাত কারনে তিনি কিন্তু একথা স্বীকার করতে ভুলে গেছেন যে, বাংলাদেশের সবচেয়ে জঘন্য সামরিক শাসন জারীর পিছনে তাঁর ও তাঁর দলের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল। এবং ১৯৯৬ সালে তিনি ঐ 'সামরিক স্বৈরাচারের' সহযোগিতায় কথিত ঐক্যমতের সরকার গঠন করেছেন। বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের ইতিহাসে সামরিক শাসনকে স্বাগত জানানো নিঃসন্দেহে একটি কলঙ্কজনক ঘটনা হিসেবে চিহ্নিত হবে। এক্ষেত্রে আ'লীগ সভানেত্রী নিজেকে যতোই সেনা শাসন ও অভ্যুত্থান বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করুন না কেন একথা কে না জানে ২৪ মার্চ '৮২ তারিখে এরশাদ দেশে সেনা শাসন জারী করলে শেখ হাসি-না বলেছিলেন আই এ্যাম নট আন হ্যাপি, অর্থাৎ আমি অখুশী নই। এর পাশাপাশি আ'লীগ দলীয় মুখপাত্র 'দৈনিক বাংলার বাণী'র প্রথম পৃষ্ঠায় সেনা শাসনকে স্বাগত জানিয়ে ছাপা হয়েছিল 'অমানিশার ঘোর কেটে যাক' শিরোনামে বিশেষ সম্পাদকীয়। এছাড়া 'লং ড্রাইভের' সেই অবিস্মরণীয় কাহিনীও তো আমাদের জানা।এরশাদও একবার স্বীকার করেছিলেন, আ'লীগকে অবহিত করেই তিনি সামরিক আইন জারী করেন। উল্লেখ্য, 'অমানিশার ঘোর কেটে যাক' শিরোনামে বাংলার বাণীতে প্রকাশিত বিশেষ সম্পাদকীয়তে সেনা শাসনকে স্বাগত জানিয়ে বলা হয়, " দেশে আবার সামরিক আইন জারী হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা এমনভাবে বিপর্যস্থ হয়েছে, আইন শৃংখলা পরিস্থিতির এমন অবনতি ঘটেছে, রাজনৈতিক স্থিতিহীনতা এমন পর্যায়ে উপনীত হয়েছে এবং সর্বোপরী ঘুষ, দুর্নীতি, স্বজন প্রীতি সামাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে এমনভাবে শিকড় গেড়েছে যে সেখান থেকে উদ্ধার পাবার আর কোন বিকল্প ব্যবস্থা নেই, একমাত্র সামরিক আইন জারী করা ছাড়া।... আমরা আশা করি যে এই পদক্ষেপের মাধ্যমে বর্তমান খাদ্য সংকট, অর্থনৈতিক বিপর্যয়.... ও নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার এই দেশ, জাতি ও রাষ্ট্রকে, দেশের জনগণকে এসব ব্যাধির হাত থেকে মুক্ত করে একটি উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথ তিনি দেখাতে পারবেন। আল্লাহ আমাদের জাতির কল্যাণে তাকে সেই শক্তি দিন। জাতির সম্মুখ থেকে অমানিশার ঘোর কেটে যাক।"
(দৈনিক বাংলার বাণী ২৫ মার্চ, ১৯৮২)

আ'লীগের দলীয় মুখপত্রে এভাবে সেনা শাসনকে স্বাগত জানানোর পর সেই দলের সভানেত্রী কিভাবে বলতে পারেন আ'লীগ ব্যতিত অন্য রাজনৈতিক দলগুলোই একমাত্র সেনা অভ্যুত্থানের সাথে জড়িত ছিলো? অবশ্য জেনারেল এরশাদের এই সেনা অভ্যুত্থানই নয় '৯৬ সালের ২০মে জেনারেল নাসিম গং যে অভ্যুত্থান সংঘটনের চেষ্টা চালান সেখানেও আ'লীগ ও তদীয় বুদ্ধিজীবী মহল বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমে সমর্থন ব্যক্ত করেন। এরূপ আরো বহু তথ্য প্রমাণ দিয়ে দেখানো যাবে আ'লীগ এবং একমাত্র আ'লীগই বরাবর চক্রান্তের সাথে জড়িত থেকেছে, কিন্তু দোষ চাপিয়েছে অন্যের ঘাড়ে।
[উপরোক্ত নিবন্ধগুলো ১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত দৈনিক দিনকালে প্রকাশিত হয়]

প্রসঙ্গঃ পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পয়ঃ প্রণালী সেনাবাহিনীর বিকল্প কর্মসংস্থান

বর্তমান আওয়ামী লীগ সরকার 'স্বপ্নের সোনার বাংলা' প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে যেভাবে চারদিকে উন্নয়নের জোয়ার বইয়ে দেয়ার কথা বলছেন সম্ভবত সেই উদ্দেশ্য পূরনে আরেক ধাপ অগ্রগতি হলো পয়ঃপ্রনালী নির্মাণের কাজে জাতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন। কঠোর প্রশিক্ষণ শেষে চাকুরীতে বহাল হবার সময় 'জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে যেখানে যাইবার আদেশ করা হইবে' বিনা বাক্যব্যয়ে সেখানে যাবার বা সরকার নির্দেশিত যেকোন কাজ করার যে শপথ সেনা সদস্যরা নিয়ে থাকেন নিঃসন্দেহে স্যুয়ারেজ লাইনের কাজে সেনা নিয়োগ সে শপথের বরখেলাপ নয়। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় সিভিল রাজনীতিবিদগণ সেনা প্রশাসন নিয়ন্ত্রণ করবে এটি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর মার্শাল ল'র সময়ে যে কোন কাজে যেকোন স্থানে সেনা মোতায়েন তো সেনা প্রশাসনেরই এক্তিয়ারভুক্ত।

পয়ঃপ্রণালীর কাজে বর্তমান সরকার যে অধিকার বলে সেনা মোতায়েন করেছেন তাকে 'ইন এইড টু সিভিল এডমিনিষ্ট্রেশন' হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। বিশেষ মুহূর্তে বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় আসা সেনাবাহিনী লালন-পালনের অন্য আর দশটা 'কারণের' একটি বটে। তাই ইতোপূর্বে আমরা সেনাবাহিনীকে বিভিন্ন বেসামরিক কর্মকান্ডে জড়িত হতে দেখেছি। সেনা সদস্যরা যেমন পার্বত্য চট্টগ্রামে দূর্গম এলাকায় মাথার ঘাম পায়ে ফেলে বিপুল সংখ্যক রাস্তাঘাট নির্মাণ করেছেন তেমনি সিরাজগঞ্জ শহর রক্ষা বাঁধটিও তাদেরই তৈরী। এছাড়া প্রাকৃতিক দুর্যোগে জানমাল রক্ষায় সেনাবাহিনীর কার্যক্রম সর্বজনবিদিত। এদিকে বেসামরিক উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডে যে শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনীই জড়িত হয়েছে তা নয়। পাকিস্তানের দুর্গম এলাকায় কারাকোরাম রেঞ্জ হাইওয়ে নির্মাণ করে পাক সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ার কোর বিশ্বব্যাপী সুনাম অর্জন করেছে। ভারতসহ অন্যান্য আরো অনেক দেশেও এধরনের উদাহরণ খুঁজে পাওয়া যাবে। তবে আওয়ামী লীগ সরকার (হয়তো) উপরোক্ত কোন লক্ষ্যে পয়ঃপ্রণালীর কাজে সেনা মোতায়েন করেনি। বরং একথা জোড় দিয়েই বলা যাবে যে, আওয়ামী লীগ সরকারের উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের স্বাদ যাতে সেনা সদস্যরাও পায় সেজন্যই এই সেনা মোতায়েন। এছাড়া বর্তমান নীতির আলোকে সেনাবাহিনীর লক্ষ্য এখন তো আর পার্শ্ববর্তী 'শত্রু'র বিরুদ্ধে পরিচালিত হচ্ছে না; তাই অযথা অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে লম্ফ ঝম্ফেরই বা প্রয়োজন কী! এ কথা যে এখন শুধু কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ তাও তো নয়, বরং রীতিমতো সরকারী প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রামের মতো একটি বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত এলাকা থেকে সেনা প্রত্যাহার তো পুরোদমেই শুরু হয়েছে। এক সময় ১৯৭২ সালে আওয়ামী লীগের হঠকারিতায় পার্বত্য চট্টগ্রামে যে বিচ্ছিন্নতাবাদের সূত্রপাত হয়, তার মোকাবেলায় তদানীন্তন সরকার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র নম্বর ২৫/১ডি-১৭২ তারিখ ২৭ জুন ১৯৭২-এর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামকে অপারেশনাল অঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করেন। এদিকে একই বছর প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অপর একটি পত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের বেসামরিক প্রশাসনের সহায়তায় সেনা মোতায়েনের জন্য সরকারী আদেশ জারী করা হয়। পরবর্তীতে শান্তিবাহিনীর

ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালের ১১ জানুয়ারী বিশেষ অপারেশনাল এলাকা পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্ধিত সংখ্যায় সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয়। এরপর ১৯৭৬ সালে যখন শান্তিবাহিনী নিজেদেরকে সংঘবদ্ধ ও সুসংগঠিত করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সার্বিক আক্রমণ শুরু করে; তখন থেকে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আধাসামরিক বাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত সেনাবাহিনীর নেতৃত্বে 'নিরাপত্তা বাহিনী' পার্বত্য চট্টগ্রামে নিয়োজিত রয়েছে।

সম্প্রতি ভারত ও জনসংহতি সমিতির সাথে 'টপ সিক্রেট' আলোচনার পর বর্তমান সরকার যেভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার শুরু করেছেন তা এক কথায় ভয়াবহ। কারন, ভারতীয় পরামর্শে ও শান্তিবাহিনীর স্বার্থে সেনা প্রত্যাহারের ফলে পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজিত দীর্ঘদিনের চেক এণ্ড ব্যালেন্স সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছে। এ সরকার যতোদিন ক্ষমতায় থাকবেন ততোদিন হয়তো ভারত ও ভারতের উস্কানীতে শান্তিবাহিনী সেনাপ্রহরাধীন এলাকায় খুব একটা বড় মাপের অঘটন ঘটাবে না কিন্তু এটি নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, যে মুহূর্তে এ সরকারের পতন ঘটবে, ওমনি শান্তিবাহিনী বিপুল বিক্রমে সশস্ত্র তৎপরতা শুরু করে দেবে। এর ফলে তারা ভারতের সহায়তায় খুব সহজেই পার্বত্য এলাকায় স্বাধীন 'জুম্মল্যান্ড' প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। তখন সেখানে সেনাবাহিনী পাঠানোর চেষ্টা করেও কোন লাভ হবে না। দীর্ঘ দু'যুগ ধরে সেখানে যে সেনা অবকাঠামো গড়ে উঠেছে তা কোনভাবেই মুহূর্তের নোটিশে পুনর্বার গড়ে তোলা সম্ভব নয়। এই সহজ সত্যটি জনার পরও আওয়ামী লীগ যে কেন পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার করছে তা এক বড় রহস্য বৈকি। তাবে তারা এ পদক্ষেপর মাধ্যমে দেশবাসীকে হয়তো এই মেসেজই দিতে চায় যে, হয় তোমরা চিরদিন আমাদের ক্ষমতায় রাখো নয়তো পার্বত্য চট্টগ্রাম হারাবে চিরদিনের মতো।

পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে সেনা প্রত্যাহার করে বর্তমান সরকার সেই সেনাবাহিনীকে সিটি কর্পোরেশনের কাজে লাগিয়ে জনগণের সামনে সেনাবাহিনীর মতো একটি ঐতিহ্যবাহী সংগঠনের ভাবমূর্তি কতোটুকু বৃদ্ধি করেছেন সেটা একমাত্র আওয়ামী নেতানেত্রীরাই বলতে পারবেন। এ পদক্ষেপকে আমরা 'বেকার সেনাবাহিনীর' বিকল্প কর্মসংস্থান হিসেবেও চিহ্নিত করতে পারি। তবে, সেনা মোতায়েনের এই ভিন্নধর্মী ব্যঞ্জনায় আমরা সরকারকে আরো কিছু 'ব্যাঞ্জনা' সৃষ্টির পরামর্শ দিতে পারি। ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের মেয়র সাহেব সফল না ব্যর্থ তা ভিন্ন কথা। কিন্তু তিনি পয়ঃপ্রনালী সংক্রান্ত ব্যাপারে যে নেহায়েতই অপরিপক্ক তা বলাই বাহুল্য। তার এই পরিপক্কতার অভাবজনিত কারনেই প্রধানমন্ত্রীকে (তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীও বটে) পয়ঃপ্রণালী কাজে সেনা মোতায়েন করতে হয়েছে। আমরা প্রধানমন্ত্রীর এই 'উন্নয়নমূলক' সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানাই। সাথে এও আশা করছি- তিনি হয়তো খুব শিগগিরই 'মশক নিধনে' ব্যর্থ হানিফ সাহেবের সহায়তায় সেনা মোতায়েন করবেন। এছাড়া বিদ্যুৎ খাতেও সেনা মোতায়েন করা যায় 'বিএনপি'র কথিত 'নাশকতমূলক কর্মকাণ্ড' নিয়ন্ত্রণ করার জন্য। অন্তত প্রাক্তন সেনা প্রধান জ্বালানী মন্ত্রী হওয়ায় সেনা সদস্যরা তার আন্ডারে বেশ ভাল কর্মতৎপরতা দেখাবেন বলেই আমরা ধরে নিতে পারি। এবং এ কাজে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব বিদ্যুৎখাতে সেনা মোতায়েন করা যায় ততোই ভাল। **(সাপ্তাহিক 'জনতার ডাক' ১২-১৮/৫/৯৭ সংখ্যা)**

সর্বাধুনিক সশস্ত্রবাহিনী গঠনের ফানুস ও আওয়ামী লীগের রণ-রাজনৈতিক দর্শন

গত ৫ ডিসেম্বর '৯৩ তারিখে পত্রিকায় তদানীন্তন বিরোধী দলীয় নেত্রী শেখ হাসিনার সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কিত কিছু মতামত বেশ গুরুত্ব সহকারে প্রাকশিত হয়। সেনাবাহিনীর দু'জন প্রাক্তন অফিসার, ক'জন জুনিয়র কমিশন্ড অফিসার ও সৈনিকের আওয়ামী লীগে যোগদান উপলক্ষ্যে শেখ হাসিনা বেশ 'ঢাক-ঢোল' পিটিয়ে ঘোষণা করেন যে, তাঁর দল ক্ষমতায় গেলে "সেনাবাহিনীর মান-মর্যাদা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে। আধুনিক উচচমান সম্পন্ন সেনাবাহিনী গড়ে তুলবে। গড়ে তুলবে সর্বাধুনিক সেনাবাহিনী"। এ মন্তব্যের পাশাপাশি তিনি বেশকিছু 'পুরানো ভাঙ্গা রেকর্ডও' বাজিয়ে শুনিয়েছেন। ও সবের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হলোঃ-

ক।"উপযুক্ত মর্যাদা ও সম্মান নিয়ে আধুনিক বিশ্বের সমমর্যাদায় সেনাবাহিনী যাতে গড়ে উঠে, বঙ্গবন্ধু সব দিক দিয়ে তার ব্যবস্থা করেছিলেন।"

খ।" বঙ্গবন্ধু জীবিত থাকতে একজন সৈনিক মারা যায়নি, ক্যু হয়নি। বিশৃংখলাও হয়নি।"

গ।"ভারতীয় মিত্রবাহিনী মাত্র তিনমাসের মধ্যে বাংলার মাটি থেকে চলে যায়। ..... পশ্চিম জার্মানীতে ৪০ বছর ধরে আমেরিকান সৈন্য মিত্র বাহিনী হিসেবে ছিল।"

ঘ।"১৯৭৫-এর পর হতে এখন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ সম্পর্কে সেনাবাহিনীর মধ্যে অপপ্রচার ছড়ানো হয়।"

ঙ।"যদি বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগ সেনাবাহিনী না চাইতেন, তা হলে কেন বঙ্গবন্ধুর ছেলে সেনাবাহিনীতে যোগদান করেছিল? কামাল মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেছিল? প্রশিক্ষণ নিয়েছিল? কমিশন প্রাপ্ত অফিসার হয়েছিল? জামাল সেনাবাহিনীর অফিসার ছিল। ইংল্যাণ্ডের বিখ্যাত সামরিক একাডেমী স্যান্ডহার্স্ট হতে কমিশন প্রাপ্ত হয়।"

একটি দেশের প্রতিরক্ষানীতি, সশস্ত্রবাহিনীর আকার-আকৃতি অতি অবশ্যই জাতীয় ঐক্যমতের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠে যেখানে গণতান্ত্রিক বিধি ব্যবস্থা অনুযায়ী 'Military Doctrine' নির্ধারিত হয়। এক্ষেত্রে সরকার পরিবর্তিত হলেও সমরিক দর্শন মোটামুটি অপরিবর্তনীয় থাকে। তবে রাজনৈতিক দর্শনের আমূল পরিবর্তন হলে সাথে সাথে সম্পূর্ণ সামরিক দর্শনের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে। 'Military Strategy' -র বিভিন্ন ভিত্তির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে বিখ্যাত সমরবিদ Clauswitz যে সমস্ত উপকরণের উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু'টি উপকরণ হলো-

ক। মনস্তাত্বিক উপকরণ, ও

খ। সামরিক বাহিনীর আকার, গঠন ও সাংগঠনিক ভিত্তি।

অন্যদিকে জাতীয় পর্যায়ে যে Grand Strategy (মহারণনীতি) গ্রহণ করা হয় সেক্ষেত্রে উক্ত মহাপরিকল্পনা বা দর্শন হচ্ছে "The art and sceince of developing and using political, economical and psychological power of a nation together with it's armed forces, during peace and war to secure national objective." অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে যে, কেবল মাত্র সশস্ত্রবাহিনীই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বা রণনীতি কার্যকর করার একমাত্র প্রতিষ্ঠান নয় এবং 'দর্শন' বা 'দিক নির্দেশনা'টিই

'Military Doctrine' বা Grand Strategy-র মূল চালিকা শক্তি।

এখানে হয়ত অনেকেই বলবেন, 'আজকের শত্রু আগামী কালকের বন্ধু' হতে পারে বা অবস্থাভেদে যুগোপযোগী ব্যবস্থা নিতে হয়। হ্যা, এ কথাটি সর্বাংশে সত্য এবং এ কথার সূত্র ধরেই দৃঢ়ভাবে বলা যায় যে, এ উপমহাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির আলোকে যতদিন আওয়ামী লীগের রাজনৈতিক দর্শন ও সবক্ষেত্রে মুরুব্বী হিসেবে ভারতীয়দের স্বার্থরক্ষার মানসিকতার পরিবর্তন না হবে ততদিন পর্যন্ত তাদের নিয়ন্ত্রন-াধীনে যত সুবিশাল, সর্বাধুনিক সেনাবাহিনী এমনকি পারমানবিক ক্ষমতাও অর্জন করা হোক না কেন তা 'ঠুটো জগন্নাথ' ছাড়া আর কিছুই হবে না। এমন্তব্যের সূত্র ধরে আরেকটি কথা বলা যায়। ধরুন বর্তমানে বাংলাদেশের যে ৭ ডিভিশন সৈন্য আছে এবং জিয়াউর রহমান প্রনীত রণনীতি অনুযায়ী আমাদের চীন ও মুসলিম দেশগুলোর সাথে ভাল সম্পর্ক যদি অব্যাহত রাখা যায় তাহলে ভারত বাধ্য হয়ে আমাদের সীমানা জুড়ে ১০ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন রাখতে বাধ্য হবে। অন্যদিকে পাকিস্তানের সীমানাতেও বিপুল সৈন্য সার্বক্ষনিকভাবে তাদের রাখতে হয়। বাংলাদেশ কখনোই আক্রমণাত্মক রণনীতির চিন্তা করে না; রক্ষানাত্মক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গ্রহণ ও অত্র অঞ্চলের 'Balance of Power' ঠিক রাখার জন্য সরাসরি 'Anti Indian stand' না নিলেও জাতীয়তাবাদী রণ-রাজনৈতিক দর্শনের জোরেই অন্ততঃ খালেদা সরকার জাতিসংঘে ফারাক্কা ইস্যু নিয়ে ১৯৯৪ সালে স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতির প্রতিফলন ঘটাতে পেরেছে। অন্যদিকে এখন যদি আওয়ামীলীগ ভারতের ক্ষেত্রে তাদের 'আনুগত্যে' কোন পরিবর্তন না আনে তাহলে অতি সহজেই একটি গুলি না ছুড়েও বাংলাদেশ সশস্ত্রবাহিনীকে 'Neutralize' করে ফেলা যাবে। সেক্ষেত্রে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদ আক্রান্ত প্রদেশগুলিতে বা পাক-চীন সীমান্তে, আমাদের সীমান্তে মোতায়েন সেনা সদস্যদের সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে। ফলে অত্র এলাকায় ভারতীয় একচ্ছত্র বা 'Hegemony' সৃষ্টির পথ অত্যন্ত সহজ হয়ে যাবে।

এ যুক্তির বিপরীতে হয়ত অনেকে বলতে পারেন ভারত আমাদের বন্ধু বা এতবড় দেশের সাথে 'Direct Confrontation' এ যাওয়া আমাদের সাজে না বরং আলাপ আলোচনার মাধ্যমে আমরা সমস্যার সমাধান করতে পারি বা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবের মত "প্রাচ্যের সুইজারল্যাণ্ড" বানিয়ে বাংলাদেশকে অযথা সামরিক খরচ হতেও বাঁচানো যায়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম হতে আজ পর্যন্ত ভারতের সদিচ্ছার কথা ও অহংকারী আগ্রাসী মনোবৃত্তি পরিত্যাগের প্রমাণ কি কেউ হাজির করতে পারবেন? বাংলাদেশ, নেপাল, শ্রীলংকার সাথে শত আগ্রাসী মনোভাবের প্রসঙ্গ না তুলে ভারতীয়দের মনোভাব সম্পর্কে দু'য়েকটি উদ্ধৃতি দেয়া যায়। ভারতীয় বিশেষজ্ঞ ভবানী সেনগুপ্তের মতে -অত্র এলাকার ভারতীয় একাধিপত্যের স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা হচ্ছে 'India will not tolerate any external intervention in a conflict situation in any South Asian country, if the intervention has any implicit or explicit anti-Indian implication. No South Asian government must, therefore, ask for external military assistance with an anti-Indian bias from any conutry.... The exclusion of India from such a contingency will be considered to be an anti-Indian move on the part of the government concerned.' **('The India Doctrine', India Today, 31 August, 1983)**. এরূপ আগ্রাসী

মনোবৃত্তি আশাকরি চীনের মতো মহাশক্তিও কোনদিন করেনি।এতকিছুর পরও আশা করা যায় জননেত্রী শেখ হাসিনা তথা আ'লীগ তার সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কিত নীতি পরিবর্তন করুক; ঐক্যমতের ভিত্তিতে রণনীতি প্রনয়নে সহায়তা করুক কিন্তু মাননীয় শেখ হাসিনা কি কতগুলি প্রশ্নের সদুত্তের দিতে পারবেন? কারন, তিনি কি বলতে পারবেন-

১) কেন, ১৯৭১ সালে জেনারেল ওসমানীকে বাদ দিয়ে লেফটেন্যান্ট জেনারেল আরোরাকে সম্মিলিত বাহিনীর প্রধান নিযুক্ত করা হলো? পৃথিবীর সামরিক ইতিহাসে কোথায় আছে যে,মূল বাহিনীকে বাদ দিয়ে সহায়তাকারী বাহিনীর আঞ্চলিক প্রধানের নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয়া হয়েছে?

২) যুদ্ধে জয়ের পর কোন মিত্রবাহিনীই আধুনিক কালের ইতিহাসে স্বাধীন বন্ধু দেশের সম্পদ লুট-পাট, প্রশাসনে খবরদারী করায় লিপ্ত হয়নি। শেখ হাসিনা বলেছেন জার্মানীতে মার্কিন ও রুশ বাহিনী ছিল প্রায় ৪০ বছরাধীকাল যাবৎ। কিন্তু তারা তো পাটকলের, বস্ত্রকলের যন্ত্রাংশ চুরি করে ও হাজার হাজার কোটি টাকার অস্ত্রপাতি কব্জা করে এমনকি বাংলাদেশ এয়ারফোর্সের অফিসার্স মেসের মতো কমোড পর্যন্ত চুরি করে নিয়ে যায়নি। আর জার্মানীর ব্যাপারটি সম্পুর্ণ ভিন্ন; দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে পরস্পর বিরোধী সামাজতান্ত্রিক শিবির ও পুঁজিবাদী শিবির একে অপরকে মোকাবেলার জন্য ও 'Balance of Power' ঠিক রাখার জন্য পশ্চিম ও পূর্ব জার্মানীতে থেকে যায়। কিন্তু ফ্রান্স মুক্ত করার পর মিত্রবাহিনী ফ্রান্সে অবস্থান নেয়নি। জার্মানী ও জাপান অক্ষশক্তির শত্রুদেশ হওয়ায় সে দেশ দুটো দখল করার পর সে দেশে তাঁরা ঘাটি গেড়ে বসে। কারণ দখলীকৃত দেশে বিজয়ী বাহিনীর অবস্থান গ্রহণ আইন সম্মত ব্যাপার। অথচ মাননীয়া শেখ হাসিনার ভারতীয় বাহিনীর অবস্থান গ্রহণ সম্পর্কীত কথায় আমরা কি তবে বুঝব যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তান দখল করেছিল? মুক্ত করে স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেনি?

এছাড়াও তৎকালীন বাংলাদেশের পাশে কি আরেকটি পাকিস্তান ছিল? সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে লুটপাটের মাধ্যমে ভারতীয় বাহিনী এমনিই দূর্ণাম কুড়িয়েছিল যে, বাংলাদেশের সাহসী সন্তানরা মেজর জলিলের মতো সবক্ষেত্রে 'মিত্রবাহিনী বিরোধী' হয়ে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে থাকে। ভারত সরকার তার অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা ছাড়াও একথা ভেবে চিন্তিত ছিল যে, দীর্ঘদিন বাংলাদেশে অবস্থান করলে তাদের বাংলাদেশীদের সাথে আভ্যন্তরীন বিরোধ ও সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে হবে এবং এর ফলে বাংলাদেশের জনগণ কখনোই ভারতকে বন্ধু হিসেবে মেনে নিবে না ও ফলশ্রুতিতে ভবিষ্যতে অন্যকোন অজুহাতে খবরদারীও করা যাবে না। সুতরাং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব একটি গোপন চুক্তিতে আষ্ঠেপৃষ্টে বেঁধে ভারতীয় সেনাবাহিনীর পোষাকের অনুরূপ পোষাকে রক্ষিবাহিনীর মতে একটি মিলিশিয়া বাহিনী রেখে নিরাপদে ভারতে প্রত্যাবর্তনই শ্রেয়। রক্ষিবাহিনীর পোষাক, অস্ত্র, প্রশিক্ষণ, মনস্তাত্বিক দিক নির্দেশনা ভারতীয় আদর্শ ও পদ্ধতির অনুকূল হওয়ায় যে কোন সময় বাংলাদেশে অপারেশন চালানোতে ভারতের কোন বাঁধা থাকার কথা ছিল না।

৩) সচেতন সকলেরই ভাল লাগে যখন শেখ হাসিনা সর্বাধুনিক সেনাবাহিনী গঠনের ঘোষণা দেন যা, যতদূর মনে পড়ে '৯১ এর নির্বাচনী সমাবেশেও তিনি তা (কচুক্ষেত

এলাকায়) দিয়েছিলেন। তখন ভাবতে ভাল লাগে যে, রণনীতির ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠায় আ'লীগ নেতৃত্ব সচেষ্ট আছেন। অথচ বিপরীতে '৯১ পূর্বেকার কথা না হয় ছেড়েই দিলাম, কিন্তু '৯১ সাল হতে সাম্প্রতিক সময় পর্যন্ত আ'লীগের সহযোগী ও অনুসারী পত্র-পত্রিকায় দলীয় 'Trade marked' বুদ্ধিজীবীরা সশস্ত্রবাহিনী সম্পর্কে একের পর এক অকল্পনীয়, রূপকথাশ্রয়ী যে সমস্ত আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছেন সেগুলোর জবাবে আ'লীগ কি বলবে? দলীয় আদর্শ যদি হয় শক্তিশালী সেনাবাহিনী গঠন তবে কেন ডঃ মুনতাসীর মামুন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত কুমার রায়ের সাথে সম্মিলিতভাবে লিখিত এক প্রবন্ধে আমাদের সশস্ত্রবাহিনীর আকার আকৃতি ছোট করার পরামর্শ ছাড়াও একেবারে সশস্ত্রবাহিনী থাকার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে পযন্ত প্রশ্ন তোলেন **(মাসিক অনুসরণ, জুন ১৯৯৩ সংখ্যা)?** আ'লীগের কোন নেতা কি এর উত্তর বলতে পারবেন যে, মুনতাসীর সাহেব তাদের দলীয় লবীর বুদ্ধিজীবী নন? এ ছাড়াও সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে একজন ভারতীয় কেন আমাদের দেশের আর্মি নিয়ে মাথা ঘামাবেন?

এদিকে রণ-রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে জাতীয় নিরাপত্তা বা National security হচ্ছে 'The ability of a nation to protect it's internal values from external thearts.' অর্থাৎ সকল পর্যায়ে জাতীয় স্বকীয়তা ও স্বার্থ রক্ষা করা জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পূর্বশর্ত। কিন্তু আওয়ামী লীগ কি আদৌ জাতীয় সাংস্কৃতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত কোন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের নিজস্ব স্বকীয়তা রক্ষা করার চেষ্টা করছে? কবি শামসুর রাহমান যখন বেগম জিয়ার শাসনামলে বাংলা একাডেমী চত্বরের একটি অনুষ্ঠানে শেখ হাসিনার হাতে হঠাৎ 'ঘন্টা' ধরিয়ে দিয়ে ও মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে বাধ্য করলেন, তখন জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদের প্রতিবাদে আওয়ামী পত্রিকাগুলি 'হাজার হাজার' পৃষ্ঠাব্যাপী বিবৃতি ঝেড়ে ও বুদ্ধিজীবীরা কলাম লিখে প্রতিবাদকারীদের 'রাজাকার' বানিয়ে ছাড়লেন ও 'নসিহত' করলেন যে মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো বাঙ্গালী সংস্কৃতির পরিচায়ক যা আমারদের হাজার বছরের ঐতিহ্য। কিন্তু যখন মৃণাল সেনের মত 'ওপারের' একজন বাঘা বুদ্ধিজীবী এসে ঐ কবি শামসুর রাহমানেরই সামনে এক সেমিনারে বললেন "মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো হিন্দু সংস্কৃতির পরিচায়ক এবং ভারতে সরকারী অনুষ্ঠানমালা মঙ্গল প্রদীপ জ্বালিয়ে উদ্বোধন করা হয় বলে ভারত সত্যিকার অর্থে ধর্মনিরপেক্ষ দেশ নয়" তখন আ'লীগের আদর্শ নিয়ে সচেতন সবার মনে কি প্রশ্ন জাগে না?

'৯১ সালের নির্বাচনে খালেদা সরকার ক্ষমতায় আসার পর ভারতের আনন্দবাজার পত্রিকা যখন বাংলাদেশকে ভারতের সাথে মিলিত হবার আহবান জানিয়েছিল **(আনন্দবাজার ২ মার্চ '৯১ সংখ্যা)** তখন এদেশের স্বাধীনতা চেতনার Sole Distributor হয়েও আ'লীগ কোন প্রতিবাদ করেনি। অন্যদিকে বঙ্গভূমি আন্দোলনের উদ্যোক্তা ডাঃ কালিদাস বৈদ্য ও চিত্তরঞ্জন সুতার তো আওয়ামী লীগেরই এম,পি ছিলেন।

কথায় কথায় আ'লীগ নেতৃবৃন্দ ও বুদ্ধিজীবী মহল বলেন বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতা বিরাজ করছে তাই ধর্মনিরপেক্ষতা ও প্রগতিশীলতা প্রতিষ্ঠা তাদের কাম্য। কিন্তু তসলিমা নাসরিনের মত উগ্র সাম্প্রদায়িক লেখিকা ও শেখ মুজিব যাকে রাসুল (দঃ)-এর প্রতি অবমাননাকর বক্তব্যের জন্য গ্রেফতার করেছিলেন সেই দাউদ হায়দার তো জাতীয়তাবাদী আদর্শ অনুসারী কোন পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি করার স্পর্ধা পায় না। বরং লেজুড় বৃত্তিকারী প্রায় সব পত্রিকাতেই তারা কলামের পর কলাম লিখে যাচ্ছেন, আবার কেউ প্রতিবাদ করলে আ'লীগের পরম ভক্ত বুদ্ধিজীবী মহলের অনেকে

তসলিমা ও দাউদের পক্ষে 'লেখকের স্বাধীনতার' নামে প্রতিবাদকারীদের কলমের এক খোঁচায় 'স্বাধীনতা বিরোধী' বানিয়ে বিবৃতি প্রদান করছেন। প্রকৃতপক্ষে আ'লীগের দর্শন যত না ভারতীয় আদর্শের সমান্তরাল তারচেয়ে বেশী বাংলাদেশের স্বকীয়তা বিরোধী। এবং এরূপ রণ-রাজনৈতিক দর্শন নিয়ে কখনোই স্বতন্ত্র চেতনার প্রতিরক্ষানীতি প্রণয়ন ও শক্তিশালী সশস্ত্র বাহিনী গঠন করা যায় না।

জেনারেল নাসিমের ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নেপথ্য কাহিনী ও আ'লীগ সংশ্লিষ্টতার প্রমাণ

২০মে '৯৬। সকাল সাড়ে আটটা। সাবেক সেনা প্রধান লে. জেনারেল আবু সালেহ মোহাম্মদ নাসিমের সেনা সদরের টেলিফোনটি ক্রিং ক্রিং করে বেজে উঠলো। উদ্বিগ্ন সেনা প্রধান টেলিফোনের রিসিভার তুলে হ্যালো বললেন। অপর প্রান্ত থেকে আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপ্টেন (অব.) তাজ (ব্রাক্ষনবাড়িয়ার বাঞ্ছারামপুরের প্রাক্তন আ'লীগ এমপি) নিজের পরিচয় দিয়ে সালাম বিনিময় করলেন।

অপর প্রান্ত থেকে নাসিম ঃ হ্যা তাজ কি খবর? We are very happy with her, tell her that our full understanding with her, support with her. She should keep on having full understanding and support for us.

তাজঃ স্যার কালকে তো আমাদের অন্যান্য নেতারা ঢাকায় ছিল না। ওরা নিজ নিজ এলাকায় ছিল। আমি সবার সাথে যোগাযোগ করব এবং বিভিন্ন এলাকা থেকেও ওনার কাছে টেলিফোন করব যে, We should back them up. আর আমি কি আমার নিজস্ব ক্যাপাসিটিতে ঢাকা শহরে একটা মিছিল করিয়ে দেব স্যার?

নাসিমঃ করিয়ে দাও।

তাজঃ আচ্ছা ঠিক আছে স্যার।

নাসিমঃ Anything you, do এইটার সাথে বিসমিল্লাহ হয়ে যাবে। বিসমিল্লাহ start-ed by you. বলবা যে সেনাবাহিনীর অভ্যন্তরীন ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা চলবে না। ইত্যাদি, ইত্যাদি, সেনাবাহিনীকে চালানোর সম্পূর্ণ দায়িত্ব সেনাবাহিনী প্রধানের। রাজাকার বিশ্বাস এই পর্যন্ত সব অবিশ্বাসের কাজ করে আসছে। তাকে স্বত্তর পদত্যাগ করতে হবে। এই রকম কিছু দিয়ে দাও।

তাজঃ ঠিক আছে স্যার। এইটার সাথে একটা মিছিল করিয়ে দেই।

নাসিমঃ হ্যাঁ, in support, বলো যে রাজাকার বিশ্বাস, একজন অবিশ্বাস।

তাজঃ এইটা আমাদের Political ব্যানারের Under -এ না করে আমার নিজস্ব যোগাযোগের মাধ্যমে সরল মনের সাধারণ লোক দিয়া করায়া দেই। ঠিক আছে।

নাসিমঃ আর শেখ হাসিনার এখন ঢাকার বাইরে যাওয়া উচিত হবে না। They may try to take action on me. প্রেসিডেন্ট পাগলা কুত্তার মতো একটা retirement দিতে পারে।

তাজঃ সে যে কোন একটা অঘটন করতে পারে।

নাসিমঃ তখন I have to surrouned বঙ্গ ভবন and tell him to get out and force

him to resign on health ground. তোমাকে এইগুলি দেখতে হবে। Legal গুলি দেখে করবা।

তাজঃ ঠিক আছে স্যার।

নাসিমঃ Thank You.

জেনারেল নাসিম তার ব্যর্থ সেনা অভ্যুত্থানের দিনে প্রক্রিয়াটা শুরু করেন এইভাবে ক্যাপ্টেন তাজের সঙ্গে রাজনৈতিক ফিল্ডে করণীয় নিয়ে আলোচনা করে। লক্ষ্য ছিল আওয়ামী লীগ রাস্তায় প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবীতে ব্যাপক মিটিং মিছিল করবে এবং এই দাবীকে জনগণের দাবী মনে করে জেনারেল নাসিম বঙ্গভবনে ছুটে যাবে এবং প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগে বাধ্য করে ক্ষমতা দখল করবে। কিন্তু মহান আল্লাহতালার খেলা ছিল অন্যরকম। পরবর্তী ঘটনাবলী আরো নাটকীয় এবং জেনারেল নাসিমের ব্যর্থতার গ্লানিভারাক্রান্ত।

১৮, ১৯, ও ২০ মে-'৯৬ এই তিন দিনের ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে ষড়যন্ত্রের ব্যাপকতা যেমন উপলব্ধি করা সহজ হবে, তেমনি সম্ভব হবে বাংলাদেশের শত্রু -মিত্র চিহ্নিত করা।

দৃশ্যপটঃ ১৮ মে

প্রেসিডেন্ট ও সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক আবদুর রহমান বিশ্বাস বঙ্গভবনে বসে আছেন। হঠাৎ কিছু উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তা তড়িঘড়ি করে প্রেসিডেন্টের কাছে উপস্থিত হন। তাদের হাতে দু'জন উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তার গভীর ষড়যন্ত্রের সুস্পষ্ট তথ্য প্রমাণ। তারা প্রমাণগুলো দেখান এবং শোনান। তিনি সব কিছু শুনে স্তম্ভিত হয়ে যান। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেনা অফিসারদের মধ্যে কোন্দল, দলাদলি সৃষ্টি, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গোপন আলোচনা, যোগাযোগ ও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকার অভিযোগে ঐ দুই সেনা কর্মকর্তাকে ন্যূনতম শাস্তি হিসেবে পূর্ণ আর্থিক সুযোগ-সুবিধাসহ বাধ্যতামূলক (অকালীন) অবসর প্রদান করেন। ঐ দিন বিকালেই প্রেসিডেন্টের এই আদেশ কার্যকর করার নির্দেশ দেয়া হয় সেনা প্রধানকে। বিকালেই প্রেসিডেন্টের আদেশ সেনা সদরে পৌঁছে যায়।

দৃশ্যপটঃ ১৯ মে

সেনা প্রধান সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়কের উক্ত আদেশ কার্যকর না করে পরদিন ১৯ মে '৯৬ প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে উক্ত দুই কর্মকর্তাকে অবসর প্রদানের গৃহীত সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার জন্য চাপ দেন। কিন্তু প্রেসিডেন্ট সেনা প্রধান জেনারেল নাসিমকে জানান যে, কর্মকর্তাদ্বয়ের অপরাধ অত্যন্ত গুরুতর হওয়া সত্ত্বেও মুক্তিযুদ্ধে তাদের অবদানের কথা বিবেচনা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ না করে শুধু অবসর প্রদান করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট উক্ত আদেশ কার্যকর করার জন্য পুনরায় নির্দেশ দেন এবং তাদের দু'জনকে লিখিতভাবে প্রেসিডেন্ট-এর কাছে রিভিউ পিটিশন পেশ করার পরামর্শ দেন। কিন্তু জেনারেল নাসিম প্রেসিডেন্টের আদেশ কার্যকর না করে ১৯ মে '৯৬ রাত ৯টায় পাল্টা ব্যবস্থা হিসাবে সেনা বাহিনীর ৪ জন

কর্মকর্তা যথাঃ মেজর জেনারেল আব্দুল মতিন, বিপি-পিএসসি মহাপরিচালক ডিজিএফআই, মেজর জেনারেল সুবিদ আলী ভূইয়া, পিএসসি, প্রিন্সিপাল ষ্টাফ অফিসার, সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, ব্রিগেডিয়ার রহিম ও কর্ণেল সালাম- ডাইরেক্টর, অপারেশন এন্ড ট্রেনিং, বিডিআরকে তাদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি প্রদান করে পরদিন ২০ মে'৯৬ বেলা ১২টার মধ্যে মেজর জেনারেল মতিন এবং মেজর জেনারেল ভূঁইয়াকে লগ এরিয়া এবং কর্ণেল সালাম ও ব্রিগেডিয়ার রহিমকে ষ্টেশন হেডকোয়ার্টারে রিপোর্ট করার জন্য সংযুক্তি আদেশ প্রদান করেন এবং একই সময়ে উক্ত অফিসারদের অফিস ও বাসস্থানের টেলিফোন লাইন বিচ্ছিন্ন করে দেয়া হয়। এছাড়া উক্ত কর্মকর্তাগণকে ঐ সময়ের মধ্যে রিপোর্ট না করলে গ্রেফতার করার জন্য ঢাকাস্থ একটি ব্রিগেড কমান্ডারকে মৌখিক নির্দেশ প্রদান করেন। সেই সঙ্গে প্রয়োজনে বঙ্গভবন ঘেরাও করার কথাও বলেন। কিন্তু জেনারেল নাসিম উক্ত সংযুক্তি আদেশ (এ্যাটাচমেন্ট) জারি করার জন্য সশস্ত্রবাহিনীর সর্বাধিনায়ক তথা প্রেসিডেন্টের অনুমতি গ্রহণ করেননি।

দৃশ্যপটঃ ২০ মে

২০ মে সকাল ৮টায় জেনারেল নাসিম টেলিফোনে আওয়ামী লীগ নেতা ক্যাপ্টেন (অব.) তাজের সঙ্গে কথা বলে মিটিং-মিছিল করার নির্দেশ দেন, যা প্রথমেই উল্লেখ করা হয়েছে। এদিন তিনি সেনা সদরে বেলা ১টার সময় কর্মকর্তাদের এক কনফারেন্স আহবান করেন এবং তাঁর অবস্থানের পক্ষে কর্মকর্তাদের সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। তিনি যুগপৎ সকল এরিয়া কমান্ডারকে (চট্টগ্রাম, রংপুর ব্যতিত) ঢাকা অভিমুখে সেনা মুভের নির্দেশ দেন।

জে. নাসিমের সাথে বাইরে থেকে যারা সহযোগিতা করেছেন ও পরবর্তীতে তার পক্ষে 'মঞ্চ' বানিয়েছেন বা পত্রিকায় লিখেছেন তাদেরও সবাই ছিল আ'লীগ মতাদর্শের। এমনকি শেখ হাসিনাও সে সময় মে.জে. মোর্শেদ ও ব্রিগেডিয়ার মিরনের অবসর প্রদান আদেশের বিপক্ষে পত্রিকায় বিবৃতি প্রদান করেন। একটি অভ্যুত্থানের পক্ষে আ'লীগের এই অবস্থান গ্রহণ রহস্যজনক বলে মনে হয় না কি?

এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দীন

বিগ্রেডিয়ার শাবাব

সেনাবাহিনীতে শুধু বিশেষ শ্রেণীর কর্তকর্তাদের পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগে গভীর হতাশা

ব্রিগেডিয়ার শাবাব আশফাকের অপ্রত্যাশিত, অস্বাভাবিক মৃত্যু- সেনাবাহিনীর পরিকল্পিত পদোন্নতি, অবসর প্রদান ও বিভিন্ন পদে নিয়োগদান প্রক্রিয়াকে সাময়িকভাবে স্থগিত রাখলেও সম্প্রতি আবার তা সক্রিয় হওয়ার আভাস পাওয়া গেছে। এক্ষেত্রে সেনাবাহিনীর অন্যতম সিনিয়র কর্মকর্তা ও বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা বিডিআর-এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল আজিজুর রহমান চৌধুরী, বীর উত্তমকে যেমন অবসর প্রদান করা হয়েছে তেমনি বেশ ক'জন ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে পদোন্নতি প্রদান করা হতে পারে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে। সূত্র জানায়, বিডিআর-এর মহাপরিচালকের পদসহ ডিজি-ডিজিএফআই পদে মেজর জেনারেল পদমর্যদার কর্মকর্তা নিয়োজিত থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে এ পদগুলোয় ব্রিগেডিয়ার র‍্যাংকের কর্মকর্তারা ভারপ্রাপ্ত হিসেবে কর্মরত রয়েছেন। এসব পদে সঙ্গত কারণেই মেজর জেনারেল পদমর্যাদার কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে। জানা যায়, রক্ষীবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত বিডিআর-এর বর্তমান উপ-মহাপরিচালক ব্রিগেডিয়ার মহিউদ্দিনকে নিয়োগ করার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া ঢাকার পার্শ্ববর্তী একটি ডিভিশনের জিওসি পদেও পরিবর্তন করার পরিকল্পনা সরকারের সক্রিয় বিবেচনাধীন রয়েছে। তবে এসব পদে ও অন্যান্য ক্ষেত্রে যেসব ব্রিগেডিয়ারকে পদোন্নতি প্রদানের কথা এপর্যন্ত জানা গেছে সেখানে বর্তমান সরকারদলীয় রাজনৈতিক মনস্ক 'রক্ষীবাহিনী'র কর্মকর্তাদের অগ্রাধিকার প্রদান করা হবে বলে সূত্র জানিয়েছে।

এদিকে মৃত ব্রিগেডিয়ার শাবাব আশফাককে কাংখিত প্রমোশন না দিয়ে পাকিস্তানে মিলিটারি অ্যাটাশে হিসেবে বদলী করায় যে হতাশা তাকে গ্রাস করেছিল তা শুধু তার ক্ষেত্রেই নয়, সেনাবাহিনীর আরো অনেক সিনিয়র কর্মকর্তার ক্ষেত্রেই ঘটেছে এমন মনে করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। কারণ ১৯৯৯ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বরে হঠাৎ করে ব্রিগেডিয়ার শাবাব আশফাকসহ ৪৫, ৪৬ ও ৪৭ তম পিএমএ লং কোর্সের অনেক যোগ্য অফিসারকে কাংখিত পদোন্নতি না দিয়ে কমান্ড থেকে সরিয়ে এমন পোষ্টে বদলির আদেশ দেয়া হয় যেখানে যাওয়ার অর্থ অন্তত আগামী ৩ বছরে আর পদোন্নতি না পাওয়া। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্রে পাওয়া তথ্য থেকে দেখা যায় যে, ৪৭তম পিএমএ লং কোর্সে ব্রিগেডিয়ার শাবাব ছাড়া অপর যে অফিসারের জেনারেল হওয়ার কথা তাকে ক'দিন পূর্ব কমান্ড থেকে সরিয়ে একটি একাডেমীর কমান্ড্যান্ট হিসেবে বদলি করা হয়েছে। পাশাপাশি ৪৫তম পিএমএ-এর পদোন্নতিযোগ্য দু'জন ব্রিগেডিয়ারের একজনকে পাঠানো হয়েছে জাতিসংঘ মিশনে ও অপরজন রয়েছেন দিল্লীতে ডিফেন্স অ্যাটাশে হিসেবে। এছাড়া ৪৬তম পিএমএ লং কোর্সের এরূপ তিনজন ব্রিগেডিয়ারের অবস্থাও অনেকটা একইরূপ। এদের একজন একটি গোয়েন্দা সংস্থার ডিজি হিসেবে কর্মরত থাকলেও অপর দু'জনকে সম্প্রতি বিদেশে-দূতাবাসে ডিফেন্স অ্যাটাশে করে পাঠানোর আদেশ জারি করা হয়েছে এবং এসব পদে রক্ষীবাহিনীর অফিসারদের প্রমোশন দেয়ার কথা। এ প্রসঙ্গে সূত্র এও জানিয়েছে যে, গত '৯৯-এর ডিসেম্বর মাসেই

ন্যূনতম একজন রক্ষীবাহিনী ব্রিগেডিয়ারসহ বাংলাদেশ আমলে কমিশনপ্রাপ্ত শর্ট কোর্সের ক'জন অফিসারকে মেজর জেনারেল বানোনোর একটি পরিকল্পনা প্রণয়ণ করা হয়েছিল। উল্লেখ্য ৪৫, ৪৬, ও ৪৭তম পিএমএ লং কোর্সের যেসব কর্মকর্তাকে সিনিয়রিটি ও যোগ্যতানুযায়ী প্রমোশন স্থগিত করা হয়েছে বা হচ্ছে তারা '৭১-এ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিতে পারেননি ও ঘটনাচক্রে হয়েছেন 'রিপ্যাট্রিয়েটেড'। কারণ তারা ছিলেন পাকিস্তানীদের হাতে আটক।

এক্ষেত্রে শুধু যে সিনিয়র কর্মকর্তাদের পদোন্নতি ও পোষ্টিং নিয়ে এমন ঘটনা ঘটেছে তাই নয় বরং জুনিয়র লেভেলেও এমন ঘটনা লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশ মিলিটারী একাডেমী থেকে কমিশনপ্রাপ্ত দু'টি লং কোর্সের প্রথম স্থান অধিকারী সোর্ড অব অনার প্রাপ্ত দু'জন কর্মকর্তাকেও পদোন্নতি দেয়া হয়নি। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, এদের একজন একটি বিরোধী দলের শীর্ষ নেতার পুত্র ও অপরজন এক সময় জে. এরশাদের এপিএস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এভাবে কোন এক অদৃশ্য কারণে সেনাবাহিনীর যোগ্যতম অফিসারদের এক বিরাট অংশকে সময় অনুযায়ী প্রাপ্ত পদোন্নতি না দেয়ার সঙ্গত কারণেই হতাশার সৃষ্টি হয়েছে বলে সচেতন মহলের ধারণা। সূত্রমতে ইতিমধ্যেই রাজনৈতিক মতাদর্শগত কারণে অনেকটা সমান্তরাল হওয়ায় বা ব্যক্তিবিশেষের পছন্দানুযায়ী পদোন্নতি ও গুরুত্বপূর্ণ পদে পোষ্টিং নিশ্চিত করা হয়েছে বা হচ্ছে। উদাহরণ হিসেবে রক্ষীবাহিনীর প্রসঙ্গ উল্লেখ করে সূত্রে জানায় যে, এ বাহিনীর ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার অফিসারদের একজন প্রধানমন্ত্রীর নিরাপত্তা বাহিনীর ডিজি, একজন বিডিআরের উপমহাপরিচালক, দু'জন দু'টি শীর্ষস্থানীয় গোয়েন্দা সংস্থার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের পরিচালক। এছাড়া মুক্তিযুদ্ধকালীন শেখ কামালের সাথে যারা এসএস-১ কোর্সে কমিশন পেয়েছিলেন তাদের ৪ জনই এখন মেজর জেনারেল- যারা দ'ুটি পদাতিক ডিভিশিনের জিওসি। অপরদিকে ১৯৭৫ সালে কমিশনপ্রাপ্ত এসএসসি-২ যেখানে শেখ জামাল অন্তর্ভূক্ত ছিলেন সেই কোর্সের অনেক অফিসারও এখন 'শেখ জামালের সহপাঠী' হিসেবে গুরুত্বপূণ পদে কর্মরত।

এদিকে ভিন্ন একটি সূত্র সেনাবাহিনীকে ঘিরে প্রাক্তন সেনাপ্রধান জে. নাসিমের একটি চক্রের বিশেষ তৎপরতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ চক্রটি পরোক্ষভাবে বিভিন্ন চ্যানেলে তাদের পছন্দ-অপছন্দ চাপিয়ে দিচ্ছে বলে জানা যায়। এক্ষেত্রে জে. নাসিম প্রস্তাবিত একটি বদলী, পদোন্নতি পরিকল্পনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তার স্বহস্তে নোট দেয়া ঐ পরিকল্পনাটি '৯৭ সালে উল্লেখিত চক্রের মাধ্যমে বাস্তবায়নের জন্য পেশ করা হয়েছিল। কিন্তু সে সময় তা পত্রিকায় ফাঁস হয়ে গেলে তা 'আপাতত' স্থগিত থাকে। কিন্তু পরবর্তীতে অপর দু'জন প্রভাবশালী মে. জেনারেলের অবসরগ্রহণের পর অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, সরকার ঐ চক্রটির হাতে আবার বন্দী হয়ে পড়েছে। এখানে প্রমাণ হিসেবে বলা যায় যে, জে. নাসিমের প্রস্তাবিত পরিকল্পনায় মে. জে. আনোয়ার হোসেন বীর প্রতিক, পিএসসিকে কোন একটি দেশে রাষ্ট্রদূত করে বাইরে পাঠিয়ে দেয়ার সুপারিশ করা হয়েছিল। একই সাথে মে. জে. সাইদ আহমেদকে সাভারস্থ নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবে নিয়োগের জন্য বলা হয়। অত্যাশ্চর্য ব্যাপার এগুলো বাস্তবেও ফলে গেছে। এখন দেখার বিষয়, বর্তমানে একটি গোয়েন্দা সংস্থার ডিজিকে উক্ত প্রস্তবনায় যেভাবে কোন বেসামরিক

কর্পোরেশনে পোষ্টিং আউট এর কথা বলা হয়েছিল তা বাস্তবে ঘটে যায় কিনা? এসব ছাড়াও ২০মে '৯৬ এর ক্যুদেতা প্রতিহতকারী বেশীরভাগ কর্মকর্তাকেই এখন সেনাবাহিনী থেকে হয় অবসর দেয়া হয়েছে নয়তো অনুল্লেখ্য পোষ্টে বদলী করা হয়েছে। উল্লেখ্য, এদের মাঝে একজন মে. জেনারেলকে অনেকটা অশোভনভাবে অবসর দেয়া হয়, একজনকে সম্প্রতি একটি পদাতিক ডিভিশনের জিওসি থেকে রাষ্ট্রদূত করা হয়েছে।

ব্রিগেডিয়ারদের মাঝে দু'জনকে বাধ্যতামূলক অবসর প্রদানের পাশাপাশি একজন ব্রিগেডিয়ারকে করা হয়েছে বিকেএসপি'র ডিজি, একজনকে দেয়া হয়েছে খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের দায়িত্ব ও অপরজন চলে গেছেন বিদেশের দূতাবাসে। এভাবেই চলছে বাংলাদেশে সেনাবাহিনী। এখানে এখন 'হতাশার' পদধ্বনি। অথচ এ যাবৎ দেশবাসী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি প্রফেশনাল 'হাইলী ট্রেইনড' প্রতিষ্ঠান হিসেবেই জেনে এসেছে। এর প্রতিটি কর্মকর্তা, সৈনিককেও জেনেছে উচ্চ প্রশিক্ষিত যোদ্ধা হিসেবে। তাই সেনাবাহিনীকে ঘিরে ১২ কোটি মানুষের সোনালী স্বপ্ন যেন হতাশার চোরাগলিতে হারিয়ে না যায় - সেটাই সকলের প্রত্যাশা।**(২০০০ সালের জানুয়ারীতে এই প্রতিবেদনটি দৈনিক ইনকিলাব-এ প্রকাশিত হয়)**
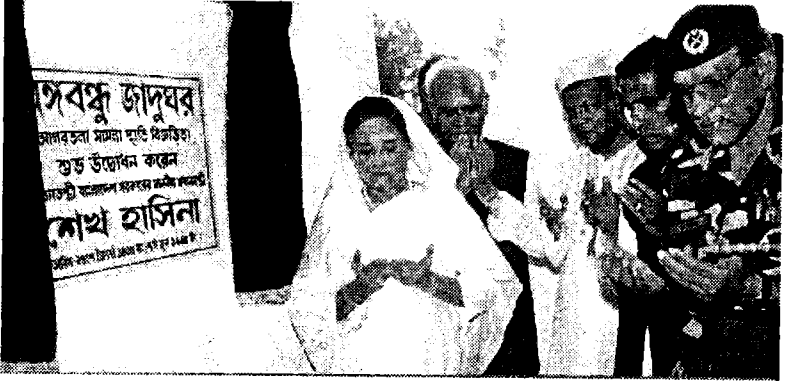
ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে 'বঙ্গবন্ধু জাদুঘর' উদ্বোধন করছেন শেখ হাসিনা। পাশে সাবেক সেনা প্রধান লে. জে. মুস্তাফিজ।

ব্যাপক সমালোচনার পরও সেনাবাহিনীতে ভারতীয় অশোক লেল্যান্ড ট্রাক সংগ্রহের পাঁয়তারা

দেশপ্রেমিক জনগণের ব্যাপক সমালোচনার মুখে এক সময় পিছু হটে গেলেও ভারতপ্রেমিক একটি কুচক্রীমহল পুনরায় সেনাবাহিনীতে অশোক লেল্যান্ড ট্রাক সরবরাহে উঠে পড়ে লেগেছে। এক সময় সেনাবাহিনীর কারিগরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও Corss Country Test and Trial -এ প্রাথমিকভাবে অকৃতকার্য ভারতে প্রস্তুত এই ট্রাক এখন 'গ্রহনযোগ্য' বা ষ্ট্যান্ডার্ড যানবাহন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে 'গ্রহণযোগ্য' অপরাপর ইউরোপিয়ান মিলিটারী ভার্সান ট্রাকের সাথে অতি সম্প্রতি ভারতীয় অশোক লেল্যান্ড ট্রাকের স্থানীয় প্রতিনিধি 'ইফাদ মোটর্স লিঃ' দরপত্র প্রদান করেছে বলে জানা গেছে। এ ব্যাপারে গত ২৩ ফেব্রুয়ারী যে টেন্ডার জমা দেয়া হয়েছে সে সম্পর্কে সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানিয়েছে যে , বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে বিতর্কিত ভারতীয় অশোক লেল্যান্ড ট্রাক সরবরাহ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে একটি চিহ্নিত মহল অনেক দূর এগিয়ে গেছে। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানে জানা যায়, সম্প্রতি সেনাবাহিনীতে ৩০০টি ৩ টন মিলিটারী ভার্সান জিএস যানবাহন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে দরপত্র আহবান করা হয়। গত ২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৯ তারিখে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর আহুত ও জনৈক মেজর সরদার মোহাম্মদ ইকবাল স্বাক্ষরিত উক্ত আহবান পত্রটি ফ্যাক্সযোগে প্রতিষ্ঠানের নিকট পাঠানো হয় ।এ প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে উত্তরা মোটর্স কোম্পানী লিঃ, ইসিএম মোটর্স লিঃ, ইরাম মোটর্স কোম্পানী লিঃ, ইফাদ মোটর্স লিঃ, খান সন্স অটোমোবাইলস লিঃ। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে এ যাবত গ্রহনযোগ্য মিলিটারী ভার্সান যানবাহন হিসেবে স্বীকৃত মার্সিডিজ, রেনল্ট, ইসুজু, ভলভো, হাইকম ও অশোক লেল্যাণ্ডের সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে উক্ত কোম্পানীগুলির কাছে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর থেকে নিয়মমাফিক দরপত্র আহবান করা হলেও গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ইসুজু, রেনল্ট ও অশোক লেল্যান্ড কোম্পানীর প্রতিনিধি ছাড়া অন্যান্য প্রতিষ্ঠান টেন্ডারে অংশগ্রহন করেনি। এদিকে টেন্ডারে প্রদত্ত দর সম্পর্কে এখনও প্রকাশ্যে কিছু জানা না গেলেও ভারতীয় ট্রাকের প্রস্তাবিত মূল্য জাপানী ইসুজু ও ফরাসী রেনল্ট-এর চেয়ে অনেক কম হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে প্রচলিত আইন মতে, সরকার ভারতীয় ট্রাক ক্রয়ে যুক্তি দাঁড় করাতে সক্ষম হবে এটাই স্বাভাবিক।

তবে এভাবে ঘুরিয়ে-পেচিয়ে নিম্নমানের অশোক লেল্যান্ড ট্রাক সংগ্রহ যে সমগ্র সেনাবাহিনীকে ধীরে হলেও ভারত নির্ভর করার অপচেষ্টা তা বলাই বাহুল্য। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণের অভিমত হচ্ছে অশোক লেল্যান্ড ট্রাক কোম্পানী দরপত্র প্রতিযোগিতায় সর্বনিম্ন দরদাতা হোক বা না হোক এই নিম্নমানের ভারতীয় ট্রাকটিকে সেনাবাহিনীর মিলিটারী ভার্সান ট্রাক হিসেবে গ্রহনযোগ্য বলে স্বীকৃতি দেয়াটাই সম্পূর্ণ অনৈতিক ও বিতর্কিত। কারণ, সেনাবাহিনীর সংশ্লিষ্ট কারিগরি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বার বার অগ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হওয়ার পরও বর্তমান সরকারের শাসন-আমলে কোন এক অদৃশ্য সম্পূর্ণ রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অনেকটা গায়ের জোরে

অশোক লেল্যান্ডকে 'গ্রহণযোগ্য'র তালিকাভূক্ত করা হয়। প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট সূত্র হতে জানা যায় যে, আশির দশকের শেষ পর্যন্ত বালাদেশ সেনাবাহিনীতে কোন মিলিটারী ভার্সান ট্রাক সংগ্রহ করা হয়নি। বেসামরিক বা সিভিল ভার্সান যেসব যানবাহন ছিল তা দিয়ে প্রয়োজন না মেটায় ১৯৮৮-'৮৯ অর্থবছরে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর মিলিটারী ভার্সান ট্রাক অনুমোদনের জন্য দরপত্র আহবান করে। এতে বিভিন্ন দেশের ১৬টি প্রখ্যাত কোম্পানী সাড়া দেয় ও তন্মোধ্যে জাপানের ইসুজু, হিনো, মিৎসুবিশি, সুইডেনের ভলভো, জার্মানীর মার্সিডিজ ও ফ্রান্সের রেনল্ট কোম্পানী স্যাম্পল প্রেরণ করে। পরবর্তীতে সেনাবাহিনীর সাপ্লাই ও ট্রান্সপোর্ট পরিদপ্তরের পরিচালকের নেতৃত্বে গঠিত একটি কারিগরি কমিটি পরিচালিত ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর মার্সিডিজ ১১১৭ইএ, ভলভো এফএল৬ ও রেণল্ট এমই ১৬০- এই তিনটি মডেল 'গ্রহনযোগ্য' বা ষ্ট্যান্ডার্ড মডেল হিসেবে অনুমোদিত হয়, যার প্রেক্ষিতে ১৯৯৩-'৯৪ অর্থবছরে ২০০টি মার্সিডিজ সংগৃহিত হয় প্রতিযোগিতামূলক দরপত্রের মাধ্যমে। মূলত 'গ্রহনযোগ্য' বলে বিবেচিত এই তিনটি কোম্পানীর মধ্য থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত ৪০০টি মার্সিডিজ ও ৫০০টি রেনল্ট মিলিটারী ভার্সন ট্রাক সংগ্রহ করে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী। এক পর্যায়ে ২৩ জুন, '৯৬-এ আওয়ামী লীগ রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারতের অশোক লেল্যান্ড কোম্পানী বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে একটি ট্রাক স্যাম্পল হিসেবে প্রদান করে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য। ঢাকাস্থ ৪৬তম পদাতিক ব্রিগেডের অধীনে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর কারিগরি Corss Country Test and Trial -এ অশোক লেল্যান্ড ট্রাক GSPC অর্থাৎ জেনারেল ষ্টাফ পলিসি কর্তৃক 'অগ্রহণযোগ্য' বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু এতে আশাহত না হয়ে অশোক লেল্যান্ডের পক্ষ থেকে বিভিন্ন চ্যানেলে তদবির অব্যাহত থাকে এবং তারা বাংলাদেশ সরকারকে লিখিতভাবে অনুরোধ করে যে, যদি মিলিটারী ভার্সান ভেহিক্যাল হিসেবে গ্রহন করা সম্ভব না হয়, তাহলে যেন অন্তত সিভিলিয়ান ভার্সান ট্রাক হিসেবে এই ট্রাকটিকে মনোনীত করা হয়। এক্ষেত্রে আবেদনকারী আরও জানায়, ট্রাকের নাম অশোক লেল্যান্ড -এর পরিবর্তে বাংলাদেশ লেল্যান্ড রাখা হবে, যার ইঞ্জিন হবে জাপানের হিনো কোম্পানীর ও বডি সংযোজন হবে বাংলাদেশে। অবশেষে নতুন প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জিএসপি'র বৈঠকে ভারতীয় লেল্যান্ড ট্রাক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য অনুমোদিত হয়। সাভারের নবম পদাতিক ডিভিশনে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর যানটি সেনাবাহিনীতে ব্যবহারের উপযোগী বলে ঘোষণা দেয়া হয়। এরপর ১৯৯৯ সালের মার্চ মাসে জিএসপিসির সভায় প্রস্তাবিত বাংলাদেশ লেল্যান্ড ট্রাক গ্রহণযোগ্য হিসেবে সার্টিফিকেট পায়। লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, ভারতীয় লবী এক্ষেত্রে কৌশলে মিলিটারী ভার্সান অনুমোদনের বদলে সিভিলিয়ান ভার্সান অনুমোদন করিয়ে নিতে সক্ষম হয়। অথচ ১৯৯৫-'৯৬ সালে লেল্যান্ড ট্রাকের মূল প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান (Parent Copmpany) ব্রিটিশ লেল্যান্ডের স্যাম্পল বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে 'ব্যবহারের অযোগ্য' সার্টিফিকেট পেয়েছে।

এদিকে তদবীরকারী ভারতীয় মহলটির চাপে অশোক লেল্যান্ডের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে পূর্বে অকৃতকার্য জাপানের ইসুজু ও মালয়েশিয়ার হাইকম (ইসুজু লাইসেন্সে প্রস্তুত) কোম্পানীর সিভিলিয়ান ভার্সান ট্রাকগুলোকে মিলিটারী ভার্সান হিসেবে ঘোষণা করে সেনা কারিগরি কমিটি। পাশাপাশি ১৯৯৮-'৯৯

অর্থবছরে ১৫০টি মিলিটারী ভার্সান ট্রাক সংগ্রহের জন্য দরপত্র আহবান করে প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর যাতে অশোক লেল্যান্ড কোম্পানীও অংশগ্রহন করে। কিন্তু এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ও জনগণের মাঝে ব্যাপক সমাালোচনার সূত্রপাত হলে সরকার বাধ্য হয়ে উক্ত দরপত্র স্থগিত ঘোষণা করে।

একপর্যায়ে সেনাপ্রধান স্বয়ং প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটিতে এমন বিবৃতিও প্রদান করেন যে, সেনাবাহিনী অশোক লেল্যান্ড ট্রাক সংগ্রহ করবে না। সেনাপ্রধান আরও জানান যে, এ যাবৎ সেনাবাহিনীতে টয়োটা কোম্পানীর গাড়ীসহ অন্যান্য উন্নত গাড়ী সন্তোষজনক বলে বিবেচিত হয়ে আসছে। এমনকি এ নিয়ে সেনা প্রশাসনের অভ্যন্তরেও সৃষ্টি হয় ব্যাপক অসন্তোষ। তবে যে কোন উপায়ে ভারতীয় নিম্নমানের ট্রাক সংগ্রহে সরকার নানা কৌশলের আশ্রয় নিতে থাকে ও এক পর্যায়ে ক্রয় নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিরোধিতাকারী দু'জন ব্রিগেডিয়ার পদমর্যাদার কর্মকর্তাকে সেনা সদর দফতর থেকে বদলী করে দেয়া হয়। ধারণা করা হয়, উক্ত দু'জন কর্মকর্তা যথাক্রমে ITD অর্থাৎ ইন্সপেশন এন্ড টেকনিক্যাল ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টরেট ও WE & S অর্থাৎ উইপেন, ইকুইপমেন্ট ও ষ্ট্যাটিষ্টিকস ডিরেক্টরেটের পরিচালকদ্বয় অশোক লেল্যান্ড ট্রাককে 'পেছনের দরজা' দিয়ে সেনাবাহিনীতে প্রবেশের বিপক্ষে ছিলেন।

এদিকে এভাবে কূটকৌশলের আশ্রয় নিয়ে পরিস্থিতি শান্ত হয়ে আসার পর অশোক লেল্যান্ড ট্রাক সংগ্রহের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে ক্রমান্বয়ে ভারতের উপর নির্ভরশীল করার অপচেষ্টা চালানো হচ্ছে বলে প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন। এক্ষেত্রে তারা বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় ও স্ট্র্যাটেজিক সংস্থাসমূহের বিভিন্ন প্রচারণার প্রসঙ্গ প্রমাণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এ পর্যায়ে কলিকাতা থেকে প্রকাশিত ১৯৯৬ সালে ২ অক্টোবর সংখ্যা 'দি ষ্টেটসম্যান' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি 'রহস্যময়' প্রতিবেদনের উল্লেখ করা যায়। Beijing and Dhaka- An Era of New Equations শিরোনামে প্রকাশিত এক রিপোর্টে পরমানন্দ ছদ্মনামে একজন প্রতিরক্ষা বিশ্লেষক কোন রাখঢাক না করে মন্তব্য করেন যে, বাংলাদেশের যদি আদৌ কোন সমরাস্ত্র ক্রয়ের প্রয়োজন হয় তাহলে তারা তা কিনতে পারে ভারত থেকে, চীন থেকে নয়। মূলতঃ বর্তমান সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর এতদঞ্চলের ক্ষমতার ভারসাম্যে যে রণকৌশলগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে ভারতীয় পত্রিকার প্রতিবেদন তার বাস্তব বহিঃপ্রকাশ। কিন্তু এদেশের স্বতন্ত্র, স্বাধীনচেতা জনগণ ভারতের অনুকূল্যে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আদৌ মেনে নেবে কিনা সেটাই ভেবে দেখার বিষয়। তবে ইউরোপিয়ান মার্সিডিজ, ভলভো, রেনল্ট এর মতো প্রখ্যাত কোম্পানীগুলো গুণগতমানের বিচারে কখনোই অশোক লেল্যান্ডের চেয়ে কম দামে ট্রাক দিতে পারবে না বলে ভারতীয় ট্রাক এক সময় 'যে কোন উপায়ে' সেনাবাহিনীতে সরবরাহ করা সম্ভব হবে, এটাও এখন সচেতন মহলের ভাবনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

(লেখকের এই প্রতিবেদনটি দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে)

গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর গুরুত্বপূর্ণ পদে রক্ষীবাহিনী ও আত্মীয় কর্মকর্তা নিয়োগ

সম্প্রতি রাষ্ট্রীয় পর্যায়ের সর্বোচ্চ দু'টি গুপ্তচর সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ পদে ব্যাপকহারে রক্ষীবাহিনীর অফিসার ও আওয়ামী নেতাদের আত্মীয়-স্বজনকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্রে জানিয়েছে যে, সামরিক গুপ্তচর সংস্থার বেশ কটি শাখা প্রধান বা পরিচালক পদে অতি সম্প্রতি ব্যাপক পরিবর্তন আনা হয়। এক্ষেত্রে উক্ত সংস্থায় যে সমস্ত পদে পরিবর্তন আনা হয়েছে সেগুলো হলো- কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরো প্রধান পদে রক্ষীবাহিনীর কর্ণেল শাহ মোঃ মহিউদ্দিন, ঢাকা শাখার প্রধান পদে রক্ষীবাহিনীর কর্নেল এএনএম মাইনউদ্দিন ও এফআরএবি'র পরিচালক পদে কমোডর রাব্বানী। উল্লেখ্য, কমোডর রাব্বানী এক সময় শেখ মুজিবুর রহমানের এডিসি ছিলেন ও বর্তমানে তিনি মুজিব হত্যা মামলার অন্যতম স্বাক্ষী। উপরোক্ত সংস্থায় রদবদল করার পাশাপাশি সেনাবাহিনীর অন্যান্য পর্যায়েও প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ নির্দেশে বেছে বেছে আওয়ামী লীগ সমর্থক কর্মকর্তাদের বসানো হচ্ছে। বিশেষ করে এনএসআই-এর মহাপরিচালক পদে শেখ হাসিনার ফুফা মে. জে. মোস্তাফিজের নিয়োগ নিয়ে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছে বলে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে।

তথ্যাভিজ্ঞ মহলের মতে, এভাবে রক্ষীবাহিনী ও আত্মীয় পর্যায়ের কর্মকর্তাদের বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থায় নিয়োগ দিয়ে শেখ হাসিনা আসলে পুরো দেশকেই গেষ্টাপো কায়দায় আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলতে চাইছেন। বিরুদ্ধে মতের কেউ যাতে কোন পর্যায়ে বাধা সৃষ্টি করতে না পারে সেজন্য এসব কর্মকর্তাকে দিয়ে বিরুদ্ধমতের রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, লেখক ও সাংবাদিকদের বিভিন্নভাবে হুমকি-ধমকি দেয়ার ঘটনা ইতিমধ্যে ঘটতে শুরু করেছে। এ ব্যাপারে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একটি সূত্র জানায়, গত বছর ডিসেম্বর মাসের ২৯ তারিখে বিভিন্ন ইসলামী দল লংমার্চের ঘোষণা দেয়ার পর উক্ত লংমার্চের উদ্যোক্তা দু'জন বিখ্যাত 'মওলানা'কে একটি গোয়েন্দা সংস্থার বিশেষ এ্যাকশন গ্রুপ উঠিয়ে নিয়ে যায় ও লং মার্চ বাতিল করা না হলে উচিত শিক্ষা দেয়া হবে বলে জানিয়ে দেয়। ফলে স্বভাবতঃই লংমার্চ বাতিল হয়ে যায়।
এদিকে বিএনপির একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা শেখ হাসিনার ফুফা মে. জেনারেল মোস্তাফিজকে অবসরকালীন ছুটি হতে পুনরায় চাকুরীতে বহাল করে তাকে সেনাপ্রধান বানানোর কুটিল পরিকল্পনার কথা ফাঁস করে দিলে ঠিক একই কায়দায় গোয়েন্দা সংস্থা হতে তাঁকে কঠোর ভাষায় হুঁশিয়ার করে দেয়া হয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এভাবে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা রক্ষায় নিয়োজিত বিভিন্ন গোয়েন্দা প্রতিষ্ঠানে 'তোফায়েল ক্যাডার' 'রক্ষীবাহিনী' ও আত্মীয়তা সূত্রে ঘনিষ্ঠ কর্মকর্তাদের গুরুত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত করার পর আ'লীগ সরকার এখন বিরুদ্ধমত দলনে উঠেপড়ে লেগেছে বলে জানা গেছে। ন্যূনতম রাজনৈতিক সমালোচনাকারী ও ভারতের সাথে দেশের স্বার্থ বিরোধী চুক্তি সম্পাদনের বিরোধিতাকারীদের বিরুদ্ধে সরকারী গোয়েন্দা সংস্থাগুলো মাত্রাতিরিক্ত তৎপরতা পরিচালনার পাশাপাশি ক্ষমতার অপব্যবহার শুরু করেছে বলেও বিশ্বস্ত সূত্র জানিয়েছে। এই সূত্র মতে হিটলারের এসএস বাহিনী বা 'ব্রাউন শার্টস' -

এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে প্রতিপক্ষ শক্তিকে দমনেরও নীলনকশা প্রণীত হয়েছে । সূত্র মতে, প্রয়োজনে গায়ের জোরে প্রতিপক্ষ ও ভিন্নমতালম্বীদের স্তব্ধ করে দেয়ার নির্দেশও দেয়া হয়েছে সরকারের নীতি-নির্ধারণী মহল হতে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র হতে জানা যায়, উক্ত নির্দেশের পরিপ্রেক্ষিতেই গত ৫ জানুয়ারী ভারত-বাংলাদেশ পানি চুক্তির বিরুদ্ধে আয়োজিত বর্ষীয়ান রাজনীতিবিদ অলি আহাদের জনসভা ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয় একটি গোয়েন্দা শাখার বিশেষ গ্রুপ। এরপর গত ৩০ জানুয়ারী সন্ধ্যায়ও ওই একই গ্রুপের সদস্যরা সশস্ত্র হামলা চালায় যুব কমান্ডের ইফতার মাহফিলে।

এভাবে শুধু যে জনসভা বা ইফতার মাহফিলে আক্রমণ চালানো হচ্ছে তা নয় বরং গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার অন্যতম অঙ্গ মতপ্রকাশের ওপর সরকার লেলিয়ে দিচ্ছে বিভিন্ন পেটোয়া বাহিনী। খবরে প্রকাশ, বিশেষ করে ভারতের সাথে সম্পাদিত উপ-আঞ্চলিক জোট, আন্তঃসীমান্ত গেরিলা তৎপরতা ও ট্রানজিট ইস্যু নিয়ে যে বা যারা সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করছেন, তাদের এসবি, ডিবি এমনকি পোশাকধারী পুলিশ দিয়েও বাসা বাড়িতে হুমকি-ধমকি প্রদান এখন নিত্য-নৈমেত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সার্ভেইল্যান্স বা নজরদারীর ব্যাপারতো রয়েছেই।

(দৈনিক দিনকালে কর্মরত অবস্থায় লেখকের এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালে । এ নিয়ে শুরু হয় তোলপাড়। যদিও প্রতিবেদনটি স্বনামে প্রকাশ করা হয়নি।)

বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে ভারতের অপপ্রচার

কূটনৈতিক ও কৌশলগত পর্যায়ে বর্তমান বাংলাদেশ সরকার যাবতীয় উপায়ে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করে চললেও ভারত এখনো অব্যাহতভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও সেনা গোয়েন্দা সংস্থার বিরুদ্ধে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলেও বিপরীতে সেই সরকারেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে ভারতের বিষোদগার সংশ্লিষ্ট মহলে যুগপৎ সংশয় ও বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছে। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতর বা ডিজিএফআই নিয়ে ভারতীয়দের সাম্প্রতিক মাথাব্যথা বেশ রহস্যজনক বৈকি।

১২ জুন '৯৬ এর কারচুপির নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকে ভারতীয় পত্র-পত্রিকাগুলো বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই-এর বিরুদ্ধে যে হারে অপপ্রচার চালাচ্ছে তা নিঃসন্দেহে সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করে দেয়ার একটি সুদূরপ্রসারী চক্রান্ত বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। অতি সম্প্রতি ভারতীয় ফ্রন্টলাইন পত্রিকায় ১৮ এপ্রিল '৯৭ সংখ্যায় একটি প্রতিবেদন এ আশংকাকে আরো বদ্ধমূল করেছে। 'Looking for peace' শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত প্রতিবেদনে কোন রাখঢাক না রেখেই বলা হয় 'আইজ্যাক মুইভা'র নেতৃত্বাধীন ন্যাশনালিষ্ট কাউন্সিল অফ নাগাল্যান্ড বা 'NSCN (I-M)' -এর বেশ ক'টি ঘাঁটি রয়েছে বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতর বা ডিজিএফআই পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা ইন্টার সার্ভিসেস ইন্টেলিজেন্স বা আইএসআই-এর সাথে মিলিতভাবে উপরোক্ত গেরিলা গ্রুপগুলোকে সহায়তা করে আসছে। যদিও আলোচ্য প্রতিবেদনে শেখ হাসিনা

ক্ষমতায় আসার পর ভারতীয় গেরিলা দলগুলোকে বাংলাদেশ সরকারিভাবে সাহায্য করছে না বলে উল্লেখ করা হয়েছে কিন্তু এ সাথে এখনো ডিজিএফআই-এর তত্ত্বাবধানে অনেক ক্যাম্প বাংলাদেশে রয়েছে বলে উল্লেখ করতেও উক্ত পত্রিকাটি পিছপা হয়নি।

এবারই যে প্রথম ভারতীয় পত্রিকায় ডিজিএফআই ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে পাকিস্তানী আইএসআই-এর সঙ্গে জড়িয়ে অপপ্রচার চালানো হয়েছে তা নয়, বরং এর বিরুদ্ধে ভারতীয় চক্রান্ত অনেক পুরানো। উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালে বেগম খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি ক্ষমতায় এসে যখন স্বতন্ত্র স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি ও প্রতিরক্ষানীতি অনুসরণ করা শুরু করে ঠিক তখন থেকেই ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এমনকি সরকারি মহল থেকেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলাদের সহায়তার অভিযোগ উত্থাপন করা হয়। বিশেষ করে ডিজিএফআই-এর সাথে 'ঘনিষ্ট সম্পর্ক' রাখার কথা সেবারই প্রথম আলোচনায় উঠে আসে। তদানীন্তন সরকার এসবের কঠোর প্রতিবাদ জানিয়ে সন্দেহজনক এলাকায় বাংলাদেশ-ভারত যৌথ পর্যবেক্ষণ চালানোর আহবান জানালেও ভারত সরকার কখনোই বাংলাদেশের আহবানে সাড়া দেয়নি। বরং অব্যাহতভাবে বিএনপি সরকারের বিরুদ্ধে এতদসংক্রান্ত একটির পর একটি নিত্য নতুন অভিযোগ উত্থাপন করতে থাকে। সে সময় ভারত কিভাবে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে উঠে পড়ে লেগেছিল তার একটি দৃষ্টান্ত হতে পারে ভারতীয় বিশেষজ্ঞ অশোক এ বিশ্বাস -এর একটি উদ্ধৃতি। ভারতের 'ইন্সটিটিউশন অফ স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ'-এর সাথে সংশ্লিষ্ট উক্ত বিশেষজ্ঞ বাংলাদেশের 'দি নিউ নেশন' পত্রিকার ৩১ আগষ্ট '৯৪ সংখ্যায় প্রকাশিত 'RAW's role in furthering India's foreign policy' শিরোনামে এক নিবন্ধে উল্লেখ করেন যে, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অত্যন্ত পরিকল্পিত উপারে মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পাশাপাশি আইএসআই-এর সাথে সংশ্লিষ্টতার হুজুগ তুলে সেনাবাহিনীতে 'এন্টি-পাকিস্তান' প্রেপাগান্ডা উসকে দিচ্ছে।

এদিকে গত সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের রাষ্ট্রমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর ভারত বর্তমান সরকারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে প্রচারণায় তারা একটুও বিরতি দেয়নি। বরং বর্তমান সরকারের ভারতমুখী অবস্থান তাদের অপপ্রচারণার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিয়েছে বলে ভারতীয় পত্রিকায় প্রকাশিত রিপোর্ট হতে বোঝা যায়। এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিমূলক একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৩ আগষ্ট '৯৬ সংখ্যা দৈনিক আনন্দ বাজার পত্রিকায়। 'খালেদা পন্থী ফৌজি কর্তাদের হাসিনা ঢাকা থেকে হটালেন' শিরোনামের উক্ত প্রতিবেদনে আগষ্ট '৯৬-এ সেনাবাহিনীর উচচ পর্যায়ের যাদের ঢাকা থেকে অন্যত্র বদলি করা হয় তাদের সবাইকেই আওয়ামী লীগ বিরোধী হিসেবে চিহ্নিত করে উক্ত সেনা কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়, "তারা বিএনপি বিরোধী আন্দোলন চলাকালে শুধু আওয়ামী লীগের তীব্র বিরোধিতাই করেনি রবং তারা আওয়ামী লীগের সাথে ঘনিষ্ট ক'জন জেনারেল ও ব্রিগেডিয়ারকে গুলি করার ইন্ধন যুগিয়েছিলেন।" এধরনের চরম মিথ্যাচার ও উসকানির আশ্রয় নেয়া ছাড়াও ভারতের পত্র-পত্রিকাগুলোতে সেনাবাহিনী সম্পর্কে এমন কৌশলে রিপোর্ট প্রকাশ করা হয় যা খুব সুক্ষ্মভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রনাধীন সেনাবাহিনীর কথিত অবাধ্যতার দিকে আলোকপাত

করে বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত।

অন্যদিকে বর্তমান সরকার প্রধান শেখ হাসিনা নিজে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে থাকার পরও তাঁর উদ্ধৃতি দিয়ে গত ১৯ ডিসেম্বর '৯৬ সংখ্যা 'The Times of India' পত্রিকায় 'Will Bangladesh now cut off support to Northeast insurgents?' শিরোনামে প্রকাশিত প্রতিবেদনে তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীআইকে গুজরালের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশের মাটিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান ও লজিষ্টিক সুবিধা প্রদানের সত্যতা স্বীকার করে নিয়েছেন। একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তাঁর দেশে ভিনদেশী গেরিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদানে কথিত অভিযোগ প্রকাশ্যে স্বীকার করতে পারেন কিনা এবং এতে নিজ দেশের স্বার্থ কতখানি সংহত হয় সে ব্যাপারে যথেষ্ট সন্দেহ থাকলেও বাস্তবে শেখ হাসিনা বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ সেনাবাহিনীকে তাঁর এই স্বীকারোক্তির মাধ্যমে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়েছেন বলে বিশেষজ্ঞ মহলের অভিমত।

এদিকে উত্তর-পূর্ব ভারতের ব্যাপারে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই-এর কথিত সংশ্লিষ্টতার বিষয়টি খোদ ভারতীয় পার্লামেন্টেও উত্থাপন করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এ নিয়ে লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে তদানীন্তন ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী মি. ইন্দ্রজিত গুপ্ত বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই'কে অভিযুক্ত করে বলেন 'পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সংশ্লিষ্টতা ছাড়াও উত্তর-পূর্ব ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে বাংলাদেশী গুপ্তচর সংস্থা বিশেষ করে ডিজিএফআই-এর প্রত্যক্ষ ইন্ধন রয়েছে।' অবশ্য ভারতীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর এ ধরনের সরকারী বিবৃতি প্রদানের প্রায় মাসখানে পূর্বে গত '৯৬ সালের নভেম্বরে ভারতীয় বিএসএফ বা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স তাদের 'রেইজিংডে' তে উত্তর-পূর্ব ভারতে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই-এর কথিত সংশ্লিষ্টতা নিয়ে ১০ পৃষ্ঠার একটি 'প্রেস নোট' প্রকাশ করে। এই প্রেসনোটে বলা হয়, বাংলাদেশী ইন্টেলিজেন্স এজেন্সির সক্রিয় সহায়তায় থাইল্যান্ড থেকে আনীত অস্ত্র উত্তর-পূর্বাঞ্চলের 'ULFA, NSCN, PLA' -র মতো গেরিলা দলগুলোর কাছে পৌছে যাচ্ছে। ..... এবং আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ এসব গেরিলা সংগঠনকে করে যাচ্ছে অপার সহযোগিতা।

সরকারী পর্যায়ে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও ডিজিএফআই-এর বিরুদ্ধে পাকিস্তানী গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সাথে সম্পর্ক রাখার অভিযোগ উত্থাপন করে ভারত মূলত বাংলাদেশের স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষা কাঠামোকে ধ্বংস করে দিতে চায়। এটা আজ দিবালোকের মতো স্পষ্ট যে, বর্তমান ভারতপন্থী আওয়ামী লীগ সরকার উত্তর-পূর্ব ভারতের গেরিলা তৎপরতারসহ অন্যান্য ইস্যুতে ভারতের স্বার্থের অনুকূলে পদক্ষেপ গ্রহণ করার পরও ভারতের বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালানোর উদ্দেশ্য হলো গণতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোর মাঝে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা বাহিনীর অবস্থান নড়বড়ে করে দেয়া। তবে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হলো এ নিয়ে বর্তমান সরকারের নিশ্চুপ অবস্থান গ্রহন। তবে সরকারের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সরকারকে 'ওভারলুক' করে অপপ্রচারের অন্তর্নিহিত রহস্য কি, তাই এখন সচেতন মহলকে দারুনভাবে ভাবিয়ে তুলছে।

(এই প্রতিবেদনটি ১৯৯৭ সালে দৈনিক দিনকাল লীড রিপোর্ট হিসেবে প্রকাশিত হয়)

সেনাবাহিনী প্রধানের পদেও কি আত্মীয়করণ করা হচ্ছে

বিভিন্ন ক্ষেত্রে দলীয়করণ ও আত্মীয়করণের ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার এবার সেনাবাহিনীতেও আত্মীয়করণের পদক্ষেপ নিয়েছে বলে নির্ভরযোগ্য সুত্রে আভাস পাওয়া গেছে। সরকারের এই উদ্যোগ গ্রহণের কারণে ইতিমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে বলে জানা গেছে। সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও একক প্রচেষ্টায় একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেলকে চাকরিতে পূনর্বহাল করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, শেখ হাসিনার ফুফা মেজর জেনারেল মোস্তাফিজুর রহমান হৃদরোগের রোগী হওয়া ছাড়াও অন্যান্য কারণে বিগত সরকারের আমলে স্বাভাবিক অবসর গ্রহণ করেন এবং উক্ত কর্মকর্তা অবসর গ্রহণের পর প্রথামত এলপিআর-এ চলে যান। প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পুনর্বার নিয়োগদান পযর্ন্ত তিনি এলপিআর-এ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি মেজর জেনারেল মোস্তাফিজকে চাকরিতে পূনর্বহালের নির্দেশ প্রদান করেন। এক্ষেত্রে বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী তার আত্মীয়কে সেনাবাহিনীর এ্যাকটিভ সার্ভিসে পুনঃনিয়োগ নির্দেশ প্রদান করেন। এখানে মে. জে. মোস্তাফিজের প্রাপ্য এলপিআরকে 'এক্সট্রা অর্ডিনারী লীভ' বা 'ছুটি' দেখানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ জারি করেন। যার ফলশ্রুতিতে মে. জে. মোস্তাফিজের এলপিআর বাতিল করা হয় ও তাকে 'ছুটি' থেকে পুনরায় কাজে যোগদান করতে বলা হয়। এ পর্যায়ে তাকে প্রথমে নিয়োগ দেয়া হয় জাতীয় নিরাপত্তা গোয়েন্দা সংস্থা এনএসআই'র মহাপরিচালক হিসেবে। বিশেষজ্ঞ মহল এই নিয়োগকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন। সবাই জানে এনএসআই একটি রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। এই সংস্থার সকল নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে নিজের একজন আত্মীয়কে নিয়োগদানের অর্থ দাড়ায় একটাই আর তা হলো নিজের ক্ষমতার অবস্থান মজবুত করা। ইতিহাসে দেখা গেছে, জার্মানির হিটলার বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার সর্বোচচ পদে গেষ্টাপো কায়দায় নিজস্ব লোকদের নিয়োগদান করতো।

এদিকে মে. জে. মোস্তাফিজকে এনএসআই'র ডিজি নিয়োগের পর পুনরায় সামরিক বাহিনীতে চাকরিতে পূনর্বহাল করায় সংশ্লিষ্ট মহল এই পদক্ষেপকে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে রদবদলের ইঙ্গিত কিনা সেটাই ভাবছেন। তারা আরো ভাবছেন, প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয়কে সময় মতো হয়তো সেনা প্রধান বানানোর পদপেক্ষ নেয়া হতে পারে। এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীকে আরো একটি পদক্ষেপ নিতে হতে পারে। আর তা হলো বর্তমান সেনাপ্রধানকে অবসরদান। অবশ্য সময়ে সেটা বোঝা যাবে। এনএসআই'র ডিজি নিয়োগদানের ক্ষেত্রে যেকোন অবসরপ্রাপ্ত সামরিক কর্মকর্তাকে নিয়োগদান করা গেলেও মেজর জেনারেল মোস্তাফিজের ক্ষেত্রে এর ব্যত্যয় ঘটানো হয়েছে।

এক্ষেত্রে অনেকেই পূর্ববর্তী ডিজি অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার আমিনুল হকের প্রসঙ্গ উথাপন করেছেন। কিন্তু এবার মে. জে. মোস্তাফিজকে এনএসআই-এর ডিজি হিসেবে নিয়োগদানের পর তাকে সামরিক চাকরিতে পূর্নবহল করা একটা ব্যতিক্রম।

উল্লেখ্য, মে. জে. মোস্তাফিজকে সেনাবাহিনীতে নেয়ার পূর্ব পর্যন্ত লে. জে. মাহবুবুর রহমানের পর দ্বিতীয় সিনিয়র কর্মকর্তা ছিলেন মে. জেনারেল মোহাম্মদ আবদুল মতিন, বীর প্রতীক, পিএসসি। বিশেষজ্ঞদের মতে, সেনাবাহিনীর প্রচলিত প্রথামতে লে. জে. মাহবুব এর পর তাঁরই সেনাপ্রধান হওয়ার কথা। সেনাবাহিনীতে তাঁর বিএ (বাংলাদেশ আর্মি) নম্বর হচ্ছে ২০৫। কিন্তু মে. জে. মোস্তাফিজকে চাকরিতে পুর্ণর্নিয়োগ করায় এখন এই ধারা পরিবর্তন হওয়ার আশংকা সৃষ্টি হয়েছে।

উল্লেখ্য, আওয়ামী লীগের ইতিহাসে সেনাবাহিনীকে আত্মীয়করণের ঘটনা নতুন নয়। বরং শেখ মুজিবুরের শাসনামলেই শেখ হাসিনার ভাই শেখ জামালকে নিয়ম-নীতি উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীতে কমিশন দেয়া হয়। এ ব্যাপারে ব্রিটিশ সাংবাদিক এ্যান্থনী ম্যাসকারেনহাস লিখিত 'বাংলাদেশ এ লিগেসী অব ব্লাড' গ্রন্থে বলা হয়েছে, শেখ জামাল নির্বাচনী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হলেও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর ছেলে হিসেবে তাকে স্যান্ডহার্স্টের ব্রিটিশ মিলিটারী একাডেমীতে প্রশিক্ষণদানের সুযোগ দেয়া হয়। কিন্তু তারপরও শেখ জামাল একাডেমীর পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ হতে পারেনি। পরবর্তীতে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় অর্থে ব্রিটিশ সরকার তাকে অফিসার হিসেবে কমিশন প্রদান করেন। এ্যান্থনী ম্যাকারেনহাসের বিবরণ মতে শেখ জামাল শেখ মুজিবের শাসনামলে জুনিয়র অফিসার হলেও তাকে এক সময় শেখ মুজিব সেনাপ্রধান নিয়োগের সিদান্ত নিয়েছিলেন।

(১৯৯৭ সালের ১ ফেব্রুয়ারী লেখকের এই প্রতিবেদনটি প্রকাশিত হয় দৈনিক দিনকালের লীড রিপোর্ট হিসেবে। জে. মুস্তাফিজকে যে সেনাপ্রধান করা হবে সে ব্যাপারেও এটাই ছিল পত্রিকার পাতায় প্রথম প্রকাশ। এর ১০ মাস পর এই ভবিষ্যতবাণী সত্যে পরিণত হয়)

জেনারেল (অব.) নাসিম সেনাবাহিনী পরিচালনা করছেন?

প্রতিরক্ষা সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়টি এখন কে চালাচেছন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে যেসব তথ্য-প্রমান পাওয়া গেছে , তাতে মনে হচ্ছে পর্দার অন্তরালে বসে ২০ মে'র ব্যর্থ অভ্যুত্থানের নায়ক, সাবেক সেনা প্রধান লে. জেনারেল (অব.) নাসিমই কার্যত প্রতিরক্ষা মন্ত্রাণালয় চালাচ্ছেন বলে প্রতিয়মান হয়েছে। শুধু তাই নয় জনাব নাসিম তাঁর অভ্যুত্থানের সাথী কয়েকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তাকে নিয়ে প্রায়শই বৈঠকে মিলিত হন। এসব বৈঠকেই তারা সেনাবাহিনী নিয়ে স্ট্রাটেজি ঠিক করেন। নির্ধারণ করেন সেনাবাহিনীর উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের কাকে কোথায় বদলী করতে হবে, কাকে রাষ্ট্রদূত করে বিদেশে পাঠাতে হবে এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের পুনঃনিয়োগ দিয়ে কোথায় বসাতে হবে। পরে এগুলি চূড়ান্ত করে প্রস্তাবাকারে সংশ্লিষ্ট স্থানে পাঠান স্বয়ং লে. জে. নাসিম।

সম্প্রতি লে. জেনারেল নাসিম তাঁর স্বহস্তে লেখা কিছু সংশোধনীসহ এরকম একটি প্রস্তাব প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়েছেন। এই প্রস্তাবে তিনি তার অবসরপ্রাপ্ত সাথী সঙ্গীদের পুনর্বহাল করে কোথায় পোষ্টিং দিতে হবে এবং সার্ভিসে আছে এমন সেনা কর্মকর্তাদের কোথায় বদলী করতে হবে তার একটা বিবরণ ও মন্তব্য করেছেন।

<u>যাদের বদলী ও পুনঃনিয়োগের কথা বলা হয়েছে, তারা হচ্ছেনঃ</u>

১. বিএ-২৩৪ মেজর জেনারেল আনোয়ার হোসেন বিপি, পিএসসি-কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা কিংবা পূর্ব ইউরোপের কোন দেশে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে দেয়া।
২. বিএ-২৩৬ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ আজিজুর রহমান বিইউ, এনডিসি, পিএসসি-কে বিডিআর-এর ডিজি থেকে সিজিএস করা।
৩. বিএ-৫৭০ মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান বিবি পিএসসি-কে নবম ডিভিশন থেকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা কিংবা পূর্ব ইউরোপের কোন দেশে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিয়োগ দেয়া।

৪. ব্রিগেডিয়ার রব চৌধুরীকে সাময়িকভাবে বিডিআর-এর ডিডিজি করা।
৫. বিএ-৬৭৯ মেজর জেনারেল সাঈদ আহমদ বিপি, এডব্লিউসি, পিএসসি-কে আর্মি হেড কোয়ার্টার থেকে নবম ডিভিশনের জিওসি করা। উল্লেখ্য, সম্প্রতি জনাব সাঈদকে ময়মনসিংহের জিওসি করা হয়েছে।
৬. বিএ-২০১ মেজর জেনারেল (অব.) মোহাম্মদ আয়েনউদ্দিন বিপি, পিএসসি-কে এডজুটেন্ট জেনারেল হিসেবে নিয়োগ দেয়া।
৭. বিএ-৩০৪ মেজর জেনারেল এএম সিরাজ, পিএসসি-কে কিউএমজি করা।
৮. বিএ-৫৭৮ মেজর জেনারেল জালাল উদ্দিন আহমদ এনডিইউ, পিএসসি-কে বঙ্গভবনে এমএসপি করা।
৯. বিএ-৩৪৫ মেজার জেনারেল রুহুল আলম চৌধূরী এনডিইউ, পিএসসি-কে বিস (BIISS) এর ডিজি বানানো।
১০. বিএ-২৭২ মেজর জেনারেল (অব.) এজাজ আহমদ চৌধুরী পিএসসি-কে বিডিআর-এর ডিজি হিসেবে নিয়োগ দেয়া।
১১. বিএ-২০৫ মেজর জেনারেল এম এ মতিন বিপি, পিএসসি-কে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ন্যাস্ত করে আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা কিংবা পূর্ব ইউরোপের কোন দেশে রাষ্ট্রদূত করে পাঠিয়ে দেয়া।
১২. বিএ-২০৫ মেজর জেনারেল ইব্রাহিম (অব.) বিপি, পিএসসি-কে চট্টগ্রামে ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি কিংবা ডিজিএফআই-এর ডিজি হিসেবে নিয়োগ দেয়া।
১৩. বিএ-১৪৯ মেজর জেনারেল গোলাম কাদেরকে (অব.) সেনা সদর দফতরে ইএনসি করে নিয়োগ দেয়া।
১৪. বিএ-২০৭ মেজর জেনারেল মোহাম্মদ মতিউর রহমান, বিপিকে আনসার ও ভিডিপির ডিজি করা।
১৫. বিএ-৪৩৮ মেজর জেনারেল গোলাম হেলাল মর্শেদ খান (অব.) বিবি, পিএসসি-কে ডিজিএফআই-এর ডিজি করা কিম্বা ২৪ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসেবে নিয়োগ দেয়া।
১৬. বিএ-২৫৮ ব্রিগেডিয়ার শহীদুল ইসলাম বিপিকে বয়সসীমা হিসাবে অবসর প্রদান করা।
১৭. বিএ-৬৮৮ ব্রিগেডিয়ার কেএম আবু বকর বিপি, পিএসসি-কে সাভারে সপ্তম পদাতিক ব্রিগেড কমান্ডার করা।
১৮. বিএ-২৫৮ ব্রিগেডিয়ার আজিজুল হক পিএসসি-কে আর্মি সিগন্যালসের কমান্ডার করা।
১৯. বিএ-১১৪৫ ব্রিগেডিয়ার সুলতান উদ্দিন ইকবাল পিএসসি-কে ইন্দোনেশিয়ায় ডিফেন্স এ্যাটাশে হিসেবে পাঠিয়ে দেয়া।
২০. বিএ-৭১২ ব্রিগেডিয়ার ফজলুর রহমান পিএসসি-কে আর্মি হেড কোয়ার্টারে এমএস করা।
২১. বিএ-৯৬২ ব্রিগেডিয়ার কামাল শহীদ পিএসসি-কে আর্মি হেড কোয়ার্টার এমএসবিআর থেকে বিএনসিসি'র ডিরেক্টর করা।
২২. বিএ-৪৬৭ ব্রিগেডিয়ার (অব.) মিরন হামিদুর রহমানকে ৮১ পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার বানানো।
২৩. বিএ-৪২০ ব্রিগেডিয়ার নুরুল হক পিএসসি-কে সাভারে ৭১ পদাতিক ব্রিগেড থেকে আর্মি হেড কোয়ার্টারে জিএসবিআর হিসেবে বদলী করা।

২৪. বিএ-৬৮৫ ব্রিগেডিয়ার খন্দকার নুরুন নবীকে জিএসবিআর থেকে আর্মি হেড কোয়ার্টার ডিএমআই হিসেবে বদলী করা।
২৫. বিএ-৯৪০ ব্রিগেডিয়ার এএমএম নজরুল ইসলাম পিএসসি-কে সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করে কোন কর্পোরেশন, কিংবা স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থায় চেয়ারম্যান করে দেয়া।
২৬. বিএ-৮৩৩ ব্রিগেডিয়ার জিল্লুর রহমান পিএসসি-কে আর্মি হেড কোয়ার্টারে ডিএমও করে দেয়া।
২৭. বিএ-৯৫৮ ব্রিগেডিয়ার ফজলে এলাহী আকবর পিএসসি-কে যুক্তরাজ্যে ডিফেন্স এ্যাটাশে করে পাঠিয়ে দেয়া।
২৮. বিএ-৯৬০ ব্রিগেডিয়ার আবিদুর রেজা খান পিএসসি-কে ১৪ পদাতিক ইঞ্জিনিয়ার ব্রিগেডের কমান্ডার করে দেয়া।
২৯. বিএ-১১৮১ ব্রিগিডিয়ার আবদুল ওহাব পিএসসি-কে সৌদী আরবের ডিসেন্স এ্যাটাশে করে পাঠিয়ে দেয়া।
৩০. বিএ-১০৭৯ ব্রিগেডিয়ার শফি মোহাম্মদ মেহেবুব পিএসসি-কে আর্মি হেড কোয়ার্টারে ডিএমডি করা।
৩১. বিএ-৭১৩ ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ মাসুদুর রহমান বিপি, পিএসসি-কে ময়মনসিংহ ৭ পদাতিক ব্রিগ্রেড কমান্ডার নিযুক্ত করা।
৩২. বিএ-৬৪২ ব্রিগেডিয়ার মোহাম্মদ আলী হাসান পিএসসি-কে ডিজিএফআই রিসার্চ এন্ড এ্যানালাইসিস উইং এর পরিচালক করে দেয়া।
৩৩. বিএ-১৭২৯ লেফটেনেন্ট কর্ণেল আনিসুল হক মৃধাকে এসএসএফ কিংবা একটি ব্যাটালিয়ানের সিও করা।
৩৪. মেজর মোহাম্মদ হাসান পিএসসিকে ৬ষ্ঠ আর্টিলারী রেজিমেন্টের টুআইসি করা।
৩৫. মেজর জেনারেল হালিমকে ডিজিএফআই থেকে আর্মি হেড কোয়ার্টারে এমজিও করে দেয়া।

জেনারেল নাসিম পরিশেষে তার প্রস্তাবে ২০ মে '৯৬ এর ব্যর্থ অভ্যুথানের বরখাস্ত, অবসরপ্রাপ্ত ১৫ জন সেনা কর্মকর্তাকে আর্মিতে পুনঃবহাল করার পরামর্শ দিয়ে বলেছেন, এই সব কর্মকর্তাকে পুনঃবহাল করা হলে তারাই কেবল মাত্র সেনাবাহিনীতে সঠিকভাবে নেতৃত্ব দিতে এবং গণতন্ত্র ও মুক্তিযোদ্ধাদের আদর্শ রক্ষা করতে পারবে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে যে, জেনারেল (অব.) নাসিমের এই প্রস্তাব কিছু দিন আগে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দেয়া হয়েছিল। পুরোটা এখনো কার্যকর করা না হলেও বিভিন্নরূপে কিছু কিছু বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কৌশলগত কারণে কিছুটা বিলম্ব হলেও তা কার্যকর করার তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে। সূত্র জানায়, এধরনের উদ্যোগের লক্ষ্য হচ্ছে গোটা আর্মিকে নের্তৃত্বহীন করে বিশৃংখলার দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যাওয়া। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে নাসিম গংদের এই ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে।

(দৈনিক দিনকালে এই রিপোর্টটি লীড আইটেম হিসেবে প্রকাশিত হয় ১৯৯৭ সালের ৯ মার্চ। লেখক জে. নাসিমের স্বহস্তে লিখিত প্রমাণপত্র পাওয়ার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় দৈনিক দিনকালের তদানীন্তন চীফ রিপোর্টার জনাব এলাহী নেওয়াজ খান রিপোর্টটি লিখেছিলেন। এটি প্রকাশের পর সেনা প্রশাসনসহ সরকারের অভ্যন্তরেও প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল। তখন জে. নাসিমের এই সুপারিশ মতে বদলী, অবসরদান করা সরকারের পক্ষে সম্ভব না হলেও পরবর্তীতে এই তালিকানুযায়ী সরকার একাধিক পদক্ষেপ গ্রহন করে)

সেনা তালিকায় অন্তর্ভুক্ত থেকে জেনারেল মুস্তাফিজের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ
সেনাবাহিনীর শৃঙ্খলা ঐতিহ্য ও আইন প্রশ্নের সম্মুখীন

আবু রুশদ ঃ সেনাবাহিনীর ভিতরে বাইরে ব্যাপক সমালোচনার পরও জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান এখনও আওয়ামী লীগের পক্ষে আগাম নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। একই সাথে তিনি সরকারী দলের বিভিন্ন রাজনৈতিক সভা-সমাবেশেও অংশগ্রহণ করছেন প্রচলিত সেনা আইনের প্রতি বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে। অথচ, এখনো তিনি এলপিআর-এ থেকে যেমন সরকারী বাড়ী, স্টাফ কারসহ অপরাপর সুবিধা ভোগ করছেন, তেমনি এ অবস্থায় যে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা যায় না সেনা আইনের সেই ধারাতেও তিনি রয়েছেন আষ্টেপৃষ্ঠে বাধা। এছাড়া এলপিআর-এ গিয়ে তিনি এসওডি (Struck of duty) অর্থাৎ সেনা তালিকার বাইরে যাননি। এক্ষেত্রে সক্রিয়ভাবে চাকুরীরত একজন সেনা সদস্যের উপর সেনা আইন যেভাবে প্রযোজ্য হয়, তেমনি এলপিআর-এ থাকা একজন সেনা সদস্যও ঠিক একই আইনের আওতাধীন থাকেন এবং এই আইন অনুযায়ী যে কোন সেনা সদস্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে রাজনীতিতে জড়িত হতে পারেন না। কেবলমাত্র এলপিআর শেষে এসওএস হওয়ার পরই অবসর গ্রহণকারী সেনা সদস্য রাজনীতিতে যেমন অংশ নিতে পারেন, তেমনি নিজ মতামত পত্র-পত্রিকা, সেমিনার-সিম্পোজিয়ামে উপস্থাপনের সুযোগ পান। এ যাবত সেনাবাহিনীর এই আইন মেনেই অবসর গ্রহণকারী সেনা কর্মকর্তাগণ রাজনীতির খাতায় নাম লিখিয়েছেন। তাই দেখা যায় প্রাক্তন সেনা প্রধান লে. জেনারেল নূরউদ্দিন খান, লে. জেনারেল মাহবুবুর রহমানসহ অসংখ্য সেনা কর্মকর্তা এলপিআর শেষ হওয়ার পরই কেবল রাজনৈতিক দলে যোগ দিয়েছন। কিন্তু সকল প্রকার আইন-কানুন প্রথার তোয়াক্কা না করেই জে. মুস্তাফিজ এলপিআর-এ থাকাকালনি নিজেকে জড়িত করেছেন প্রকাশ্য রাজনীতিতে এবং এক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই তিনি বহু উল্টা-পাল্টা কথাবার্তাও বলেছেন তথাকথিত 'সুধী সমাবেশে' যোগদান করে। এ নিয়ে সেনাবাহিনীর সকল স্তরে ব্যাপক অসন্তোষও দানা বেঁধে উঠেছে বলে জানা গেছে। অবশ্য পত্র-পত্রিকায় সমালোচনার প্রেক্ষিতে কিছুদিন চুপচাপ থাকলেও আবারও তিনি মাঠে নেমেছেন আওয়ামী সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার জন্য। জানা যায়, এ লক্ষ্যে তিনি গত ২২ মার্চ (বৃহস্পতিবার) রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়নে এক 'সুধী সমাবেশে' অংশগ্রহণ করেন। ইউপি চেয়ারম্যান আলতাফ হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে তিনি রংপুরবাসীকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'এরশাদ ৯ বছর ক্ষমতায় থাকাকালে রংপুরের কোন উন্নয়ন করেননি। তাই আপনারা লাঙ্গলকে ভুলে নৌকা 'মার্কায় ভোট দিন'। এমনকি সকল লাজ-লজ্জায় মাথা খেয়ে তিনি একজন 'অতি বিশ্বস্ত আওয়ামী চাটুকারের' ন্যায় ভবিষ্যদ্বাণী করেন, 'আ'লীগ আগামীতে আবারও ক্ষমতায় আসবে এবং শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হবেন।' এভাবে কথিত 'সুধী সমাবেশে' যোগদান করা ছাড়াও জে. মুস্তাফিজ আওয়ামী মন্ত্রী, এমপি ও জেলা নেতৃবৃন্দের সাথে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন দলীয় কর্মকাণ্ডেও প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করছেন।

এদিকে জে. মুস্তাফিজের এসব বেআইনী কর্মকান্ড নিয়ে চাকরিরত ও অবসর গ্রহণকারী সেনা সদস্যদের মাঝে চরম অসন্তোষ দেখা দিয়েছে বলে একাধিক সূত্রে জানা গেছে। বিশেষ করে যেসব অফিসার এখন এলপিআর-এ আছেন তারা অত্যন্ত ক্ষোভের সাথে প্রশ্ন করেছেন, কেবলমাত্র আওয়ামী সমর্থক হওয়ার সুবাদে যদি জে. মুস্ত াফিজ এলপিআর-এ থেকেও রাজনীতি করতে পারেন তাহলে তারা কেন রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে পারবেন না? নাকি সকলের ক্ষেত্রে যা 'নষ্টামি' জে. মুস্তাফিজের

কাছে তা 'লীলাখেলা'?

যদি তা না হল ও সকলের জন্য থাকে একই ব্যবস্থা, তাহলে এলপিআর-এ এসেই সেনা কর্মকর্তারা রাজনীতিতে জড়িত হতে পারবেন কিনা এ প্রশ্নের উত্তর জানতে চেয়েছেন এলপিআর ভোগকারী বেশ ক'জন অফিসার। এদের একজন যিনি সেনাবাহিনীতে মেজর জেনারেল পদে কর্মরত ছিলেন তিনি বলেছেন, জে. মুস্তাফিজ আ'লীগের পক্ষে কথা বলায় তা হয়ত আপাতদৃষ্টিতে আওয়ামী লীগ নেতা-কর্মীদের কাছে বেশ ভালই লাগছে, কিন্তু তারা একবারও কি চিন্তা করে দেখেছেন-এভাবে যদি এলপিআর না শেষ হতেই অন্যান্য অফিসারও বিভিন্ন রাজনৈতিক দরে ফোরামে সক্রিয় হয়ে উঠেন তাহলে আর্মির শৃঙ্খলার কি অবস্থা হবে? অবশ্য এভাবে 'আওয়ামী পছন্দ' সেনা কর্মকর্তা মুস্তাফিজ সাহেব জেনে-বুঝেই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইছেন কিনা তাও এখনি খতিয়ে দেখা প্রয়োজন বলে উল্লিখিত কর্মকর্তা মতপ্রকাশ করেন। তিনি আরও বলেন, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ঐতিহ্য ও রীতির ক্ষেত্রে এমনিতেই জে. মুস্তাফিজের সেনাপ্রধান হিসেবে নিয়োগ এক কালো অধ্যায়, সেখানে আরও বিতর্ক সৃষ্টি কোন মতেই কাম্য হতে পারে না। অবশ্য তার মতে, এই 'ফোর স্টার জেনারেল' সাহেব এখন যেভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করে চলেছেন তাতে তাকে 'চার তারকা জ্যোতিষ' হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। তবে হাজারও ভাগ্য গণনা করলেও জ্যোতিষী যেমন নিজের ভাগ্য অনুধাবন করতে পারেন না, জে. মুস্তাফিজের কপালেও হয়ত ঘটতে চলেছে তাই।

(দৈনিক ইনকিলাব ঃ ৩১/০৩/২০০১)

আ'লীগ বুদ্ধিজীবীদের সেনাবাহিনী বিরোধী প্রচারনা

ফরমালি আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ সব সময়ই বলেন যে, তারা কখনোই সেনাবাহিনী বিরোধী নন। ক্ষমতায় থাকার সময় তো তারা সেনাবাহিনীর জন্য জীবন দিতে প্রস্তুত- এমন ভানও করতেন। কিন্তু অবাক ব্যাপার হলো একদিকে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ সশস্ত্রবাহিনীর বিরুদ্ধে কিছু বলেন না, অথচ তাদের দলীয় বুদ্ধিজীবীরা ঠিকই যাচ্ছে তাই লিখেন সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। এমনকি সেনাবাহিনীর প্রয়োজন নেই- এই কথাটাও তারাই প্রচার করেছেন পত্র-পত্রিকায়। আওয়ামী নেতৃবৃন্দ এসবের কোন প্রতিবাদ কখনো করেননি। এছাড়া যেসব পত্রিকায় এ জাতীয় অপপ্রচার চালানো হয় সেগুলোও আ'লীগপন্থী। এ থেকে কি এটাই প্রমাণিত হয় না যে, আ'লীগ রাজনীতির স্বার্থে ভান করে। আর পরোক্ষভাবে দলীয় বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিকদের লেলিয়ে দেয় সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে। মুনতাসীর মামুনের নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রতিবেদনটি অন্ততঃ তাই প্রমাণ করবে।

'আপনার পরিচয়?' সেনাবাহিনী তোয়াজ পার্টি

মুনতাসীর মামুন

গতকাল দৈনিক জনকণ্ঠে 'সেনানিবাসে সাধারণ মানুষকে যখন-তখন অযথা হয়রানি ও নাজেহাল' শীর্ষক খবরটি পড়ে আমার এক বন্ধু বললেন, 'আগের থেকে তো এখন অবস্থা অনেক ভাল, দেখলে গুলি করে না বা বুট ওঠায় না। বরং অত্যন্ত ভদ্রভাবে জিজ্ঞাসা করে- আপনার পরিচয়?'

হ্যাঁ, কথাটা ঠিক। ঢাকা সেনানিবাসে ঢোকার সময় কোন না কোন সময় এ প্রশ্নের সম্মুখীন সবাইকে হতে হয়েছে। এই পরিচয়ের ক্রাইসিস আমাদের অনেকদিনের। সেটা এত সহসা মিটবে বলেও বোধ হয় না।

সেনা সদস্যরা পরিচয় জানতে চায় কেন? চায় এ কারণে যে, মানুষকে বিশ্বাস করা যায় না। সেদিক থেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করা ঠিকই আছে। রাজনীতিবিদরা ছাড়া আমরাও যে সেনাবাহিনীকে খুব বিশ্বাস করি সে কথা জোর দিয়ে বলা যাবে না। 'সেনাবাহিনী সার্বভৌমত্বের প্রতীক'- একথা প্রত্যেক রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন। জনগণ সার্বভৌমত্বের প্রতীক- একথা বলেননি কখনও জোর দিয়ে। 'সেনাবাহিনী দেশের নিরাপত্তার অতন্দ্র প্রহরী' - সেটি সব প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, বলেননি দেশের নিরাপত্তা বিধান করতে পারে একমাত্র সাধারণ মানুষ।.........
সেনাবাহিনী বাংলাদেশের বা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর? এর উত্তর নির্ধারণ করতে পারলে, সংসদের প্রতিরক্ষা বিষয়ক কমিটিতে বিতর্ক না করলেও চলে।
এর উত্তর আমার কাছে অন্য রকম। আপনারা যে যত গণতন্ত্রের কথাই বলুন না কেন, আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর। না হলে গত ২৫ বছরের প্রতিটি বাজেটে খালি তাদের বরাদ্দই বাড়ত না। যে টাকা খরচ হয়েছে সেনাবাহিনীর কারণে সে টাকা কৃষি বা সাধারণ মানুষের পিছে খরচ করলে দেশ সোনার বাংলা না হোক একটা পর্যায়ে পৌঁছত।
এই উত্তরের আরেকটি পরিপূরক অংশ আছে। রাজনীতিবিদরা বলেন, 'সেনাবাহিনী দেশের আমানত'। খেয়াল করবেন দেশের ১৪ কোটি মানুষ আমানত নয়। এই আমানত খুব সতর্কতার সঙ্গে হেফাজতে রাখতে হয়। নাহলে বিপদ হতে পারে। সে কারণে বাংলাদেশের সমস্ত রাজনৈতিক দল সেনাবাহিনীকে সুন্দরভাবে লালন করেছে, সাধারণ মানুষকে নয়। আর করবে না-ই বা কেন? জাতির পিতাকে সে সময় ৮ কোটির কেউ হত্যা কবেনি, রাষ্ট্রপতি জিয়াকেও সে সময়ের ১০ কোটির কেউ হত্যা করেনি। জেনারেল এরশাদের আমলে এত খুন-খারাপি, লুটপাট হলো তার সঙ্গে ১৩ কোটির সাধারণরা জড়িত ছিল? এ যুক্তিগুলো বিশ্লেষণ করলে আমরা যে সত্যের সম্মুখীন হই তা হলো- আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের মূল বিষয় হচ্ছে কোন রকমে একটা ফ্ল্যাগঅলা গাড়িতে চড়া। তাদের ধারণা- সেনাবাহিনী তোয়াজ করা মানে জাতির খেদমত করা, অতবএব তা ফরজ। এদিক থেকে দেখলে সব রাজনৈতিক দল এক ঐকমত্যের রাজনীতি করে সে ক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে এদের নাম হতে পারে সেনাবাহি-নী তোয়াজ পার্টি। উদাহরণ চান?
প্রতিরক্ষা কমিটির সদস্যরা হলেন, সর্বঅবসরপ্রাপ্ত মেজর.জেনালে শফিউল্লাহ, কর্ণেল শওকত আলী, কর্নেল ফারুক খান, কর্নেল আকবর হোসেন, মেজর আখতারুজ্জামান, জিএম কাদের ও রেজাউল করিম। প্রথম তিনজন আওয়ামী লীগের, তার পরের দু'জন বিএনপি'র।..........
ডিএফআই ছাড়া কোন সরকার প্রধান চলেছেন? চলেননি? তবে, বলে রাখা ভাল, সব সরকারপ্রধানেরই পতন হয়েছিল ডিএফআইয়ের পরামর্শ শুনে। এর কোন ব্যতিক্রম হয়নি। এখনও হবে না।
ব্যক্তিগত একটি উদাহরণ দেই। জরুরী কাজে একবার রাস্তা শর্টকাট ও ভিতরে বসবাসকারী একজনের বাসায় যাওয়ার দরকার পড়ে। যথারীতি বাধা দেয়া হয়।
'আপনার পরিচয়'?
পরিচয় জানাই।
'কোথায় যাবেন?
বাসার স্থান বলি (নম্বর মনে ছিল না)।
'কোথায় সেটা? এদিক দিয়ে যাবেন কেন?'

'এদিক দিয়ে দেখা করে মিরপুর যাব।' বিরক্ত হয়ে বলি। 'বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হয়ে আপনি সঠিক কথা বলছেন না। আপনি আর যেতে পারবেন না।' এ ঘটনা অবশ্য বর্তমান সেনাধ্যক্ষের নিয়োগের ঠিক আগের ঘটনা। যারা আগে-পিছে গাড়ির বহর নিয়ে চলেন তারা নাজেহালের কি বুঝবেন? আর অভিযোগ? বাংলাদেশে কার ঘাড়ে কয়টা মাথা আছে যে সেপাই-শাস্ত্রীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবেন? আর কার কাছে করবে। জেনারেলের কাছে পৌঁছা যাবে? আমি সেনাধ্যক্ষের কাছে একটি সাক্ষাতকার চেয়ে চিঠি দিয়ে প্রায় মাস দু'য়েক অপেক্ষা করছি। কোন উত্তরই পাইনি।

সেনা সদস্যদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হোক তা আমাদের কারও কাম্য নয়। তাদের বাড়িঘর দফতর স্টীলের দেয়াল দিয়ে ঘিরে, ট্যাঙ্ক ও কয়েক কোম্পানি সৈন্য রাখা হোক। কারও আপত্তি নেই। কিন্তু রাস্তা দিয়ে অবাধে চলতে দেয়া হবে না কেন? কারণ যে টাকা দিয়ে রাস্তা বানানো হয়েছে সে টাকায় আমাদেরও হক আছে।

এ সমস্যা সমাধানের দু'টি বিকল্প আছে। এক. ১৯২৪ সালের আইন লুপ্ত করা এবং ভিতরের সব অসামরিক লোক বের করে দেয়া। আইন থাকবে অথচ তা কারও কারও জন্য প্রযোজ্য, কারও কারও জন্য নয়, তা তো এ স্বাধীন দেশে হতে পারে না। দ্বিতীয়ত কোন বন-জঙ্গলে ক্যান্টনমেন্ট সরিয়ে নেয়া। আমরা আগেও বলেছি, এখনও বলছি, ঢাকা শহরে বিশাল পিলখানা (বিডিআর দফতর) ও সেনানিবাস রেখে ঢাকা মেট্রোপলিটন শহর হতে পারে না। ঢাকাকে আমরা মেট্রোপলিটন শহর হিসাবে দেখতে চাইলে অবশ্যই ঢাকা সেনানিবাস সরাতে হবে।

তবে সিভিলিয়ানদের কথায় কিছুই হবে না। সুতরাং বিদ্যমান পরিস্থিতিতে ক্যান্টনমেন্টের ভিতর দিয়ে যেতে হলে নিম্নোক্ত পন্থা অবলম্বন করুন - 'আপনার পরিচয়?'

'সেনাবাহিনী তোয়াজ পার্টি'- এই হবে আপনার উত্তর।

নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাকে নাজেহাল করা হবে না।

(১৮ মে, ২০০০, দৈনিক জনকণ্ঠ)

সামরিক বাজেট

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ মুনতাসীর মামুন সাপ্তাহিক 'যায় যায় দিন' (১৫ জুন ১৯৯৩) পত্রিকাতে প্রবন্ধ লিখেছেন 'অগ্রাধিকার শিক্ষা নয়, প্রতিরক্ষা'। নিবন্ধে তিনি প্রতিরক্ষা খাত থেকে এক-তৃতীয়াংশ অর্থ কমিয়ে মানব সম্পদ উন্নয়নে ব্যয় করার পরামর্শ দেন।

ডঃ মুনতাসীর মামুন ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ডঃ জয়ন্ত কুমার রায় ঢাকার 'মাসিক অনুসরণ' (জুন ১৯৯৩)-তে 'কেন সামরিক শাসন, কারা কখন কিভাবে আনে' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় একজন অধ্যাপকের সঙ্গে মিলিতভাবে এই প্রবন্ধে বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে একপক্ষীয় মন্তব্য করা হয়েছে (সবচেয়ে মজার ব্যাপার ভারতীয় অধ্যাপক কিন্তু দারিদ্র্যপীড়িত ভারতে চীন-ভারত সীমান্ত সংঘর্ষের (১৯৬২) পর হতে ক্রমবর্ধমান প্রতিরক্ষা বাজেট সম্পর্কে টু-শব্দটিও করেননি)। তারা লিখেছেন ঃ 'বাজেটের সিংহভাগ বরাদ্দ থাকে সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এবং সে বাজেট সংসদে আলোচনা করা যায় না।' তারা লিখেছেনঃ 'পার্লামেন্টে আলোচনা করতে হবে সশস্ত্র বাহিনীর বাজেট।' ভারতীয় অধ্যাপকের সাথে মিলিতভাবে যিনি বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর বিরুদ্ধে কলাম লিখতে পারেন তাকে কি দেশপ্রেমিক বলা যায়? যদি তিনি তা না হন তাহলে তার পছন্দনীয় আ'লীগ কী?

শেখ মুজিব জেনারেল সফিউল্লাহকে বলেছিলেন আমার সশস্ত্র বাহিনীর কোনো প্রয়োজন নেই

দিনকাল রিপোর্ট ঃ ভারতীয় সেনাবাহিনী চায়নি, আমাদের একটি সুশৃঙ্খল সেনাবাহিনী গড়ে উঠুক, এ কথা বলেছেন মুজিব আমালের সেনাবাহিনী প্রধান ও বর্তমানে আওয়ামী লীগ হতে নির্বাচিত সংসদ সদস্য মেজর জেনারেল সফিউল্লাহ (অবঃ)। 'সেক্টর কমান্ডাররা বলছেন, মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা' শিরোনামে প্রকাশিত বইয়ে সংকলিত এক সাক্ষাৎকারে জেনারেল সফিউল্লাহ এই মন্তব্য করেন।

জেনারেল সফিউল্লাহর ভাষ্যমতে, দীর্ঘ ১১ বছর পাকিস্তানী শাসকদের কারাগারে অন্তরীণ থাকার অভিজ্ঞতা নিয়ে শেখ মুজিব তাকে বলেছিলেনঃ স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য তাঁর কোন সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই। এমন কি শেখ মুজিব তাকে এও বলেছিলেন যে, যে কোন বিপদে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তার (শেখ মুজিব) ডাকে ছুটে আসবেন তাকে রক্ষা করতে।

১৯৯৪ সালে বিবিসি বাংলা বিভাগের উপ-প্রধান ও প্রাক্তন সেনা কর্মকর্তা মেজর এসএম আলী (অবঃ) কৃত গবেষণাপত্র 'European Network of Bangladesh Studies'-এ এই তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। ঐ গবেষণাপত্রের 'Civil Military Relations in the Soft state: The case of Bangladesh' অধ্যায়ে জনাব এসএম আলী জেনারেল সফিউল্লাহর সাথে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দিয়ে এ তথ্য প্রকাশ করেন। **(দৈনিক দিনকাল , ৫-১১-৯৬)**

বরিশালে যুবলীগের সম্পাদক পিটিয়েছে সেনা কর্মকর্তা

জেলা যুবলীগ সম্পাদক ফজলুল করীম শাহীন এবং তার সহযোগী ক্যাডার মিরাজ বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন ও তার ভাইকে প্রকাশ্যে মারধর করেছে এবং হত্যার হুমকি দিয়েছে। মঙ্গলবার বিকালে টিএন্ডটি অফিসে সংঘটিত এ ঘটনার সত্যতা আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী একাধিক সূত্র স্বীকার করে বলেছে, বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।

উল্লিখিত সূত্র এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে জানা গেছে, সাভার সেনানিবাসে কর্মরত আর্টিলারি কোরের ক্যাপ্টেন ফিরোজ ছুটিতে বরিশাল কাউনিয়া রোডস্থ সিরাজ মহলে নিজ বাড়িতে বেড়াতে আসেন। বরিশাল টেলিযোগাযোগে ২৯ এপ্রিল সংঘটিত বিপর্যায়ের পর ঐ এলাকার অনেক টেলিফোন এখনো ভালো হয়নি। তাই ক্যাপ্টেন ফিরোজ তার খালাত ভাই মনিরকে নিয়ে বাসায় টেলিফোনের বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য মঙ্গলবার বিকালে টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যান। এ সময় এক্সচেঞ্জের একজন প্রকৌশলীর চেয়ারে বসা জেলা যুবলীগ সম্পাদক এবং ফ্যাক্স ফোন ব্যবসায়ী ফেইথ শাহীনের কাছে ক্যাপ্টেন ফিরোজের পরিচয় দেওয়ার পরও লাঞ্ছনার শিকার হন।

এরপর যুবলীগ সম্পাদক টিএন্ডটির কাছেই তার ফ্যাক্স-ফোনের দোকানে ক্যাপ্টেনের খালাত ভাই মনিরকে ডেকে নিয়ে আটকে রেখে মারধর ও নির্যাতন করে এবং মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। কিছু পরে ফেইথ শাহীন তার সহযোগী ক্যাডার মিরাজ ও জিম্মি মনিরসহ আবারো টিএন্ডটি এক্সচেঞ্জে গিয়ে ক্যাপ্টেন ফিরোজের ওপর চড়াও হয়ে তাকে মারধর করে এবং ক্ষুর বের করে হত্যার হুমকি দেয়। এ সময়ে ক্যাপ্টেন ফিরোজ ও তার খালাত ভাই মনির কোনোরকমে আত্মরক্ষা করে বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানালে অভিযুক্ত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হলেও তা পালন করা হয়নি। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত কোনো মামলা হয়নি এবং এ বিষয়ে আপোস মীমাংসার চেষ্টা চলছে। **(দৈনিক ভোরের কাগজ, ২৩/০৫/২০০০)**

The Frigate Behemoth

Special correspondent: After the MiG-29 purchase bonanza in hard cash and the hush-hush on-going merry deal for spares for the commission agent(s), Bangladesh Navy now has a monumentally-expensive ocean-frigate in its tiny fleet. It cost Taka 550 crore, again in hard cash, bottoming out half of the country's naval budget.

Christened as BNS Bangabandhu, the only and omni title for all and sundry, the newly-built state-of-the -art frigate hit the waters from the production-line in Okpo Shipyard in Koje Islands of South Korea belonging to Daewoo Shipbuilding and Enginering Company and sailed for Chittagong in shining armours. It reached Chittagong on June 16 without much of an ado and bombast.

Daewoo, the troubled South Korean *chaebol*, won the bid of the 100-million-dollar procurement festival to build the 103.5-meter ocean-behemoth in 1997 for the Bangladesh Navy. Daewoo says it won the bid on the merit of price and specifications. They, however declined to comment on the controversies over the tendering procedures and alleged graft as also was silent on the recurrent cost maintenance and operations of the frigate. The warship is fitted with armaments like torpedo and missile-launchers from Italy.

What will be cost of feeding the giant? Sources in the Navy say that the firing of a torpedo alone, not seen to be needed yet, will cost half-a-million dollar. The monthly expenses on upkeep and maintenance is estimated at more than a million Taka, that is approximately USD 8000.

Each of the four generators require 100 gallons of high sulphur diesel oil per hour and the ship should be running for at least a third of the month. The new warship reportedly will guard the Bangladesh maritime boundary from pirates who poach marine resources and also run deep-sea smuggling. A Frigate-worthy war, indeed!

Besides, the Navy will have to use the weapons from time to time to keep the gunnery in running condition.

Let's forget about the small and medium-range guns and take the instance of the torpedo launcher and missile launcher. The question arises as to how many torpedoes and missiles will be fired every year just to keep them running.

The behemoth is equipped with four missile launchers, two torpedo launchers, 76-mm super rapid guns and a pair of heavy machineguns. Sources said that the rnage of the super rapid guns is only five nautical miles.

What do you do if you have the gunnery system loaded? Where will you get the ammunition of a system built by Italy? Is it available in the open market? Well, you have to buy it from Italy and there comes the local agent.

A former senior naval officer and a close relative of a senior serving army officer are reportedly also involved in the ammunition deal. "Otherwise making the whole deal with Korea and that too loaded with Italian armaments do not make sense," pointed out a senior naval officer who requsted anonymity.

Besides the Naval Chief, a delegation of eight members of parliament had visited South Korea to see the making of the ship and were impressed with the battleship that has a maximum speed of 25.2 knots with full load of 2320 tons.

Daewoo is one of South Korea's leading arms manufacturers. It has built a 3,800-ton destroyer and diesel-powered submarines for the South Korean Navy. South Korea's Hyundai Heavy Industries Company also sold a naval patrol ship to Bangladesh in 1995.

Daewoo claims that the ship has been built in accordance with Ulsan-class frigate of the South Korean Vavy in terms of shock, vibration, noise, heat, magnetic signature, fire-fighting and vital systems such as propulsion plant, navigation, communication and combat systems.

Captain ZU Ahmed is steering the warship with about 150 crew members who were provided a monthlong on-job training by the builders.

It will be the fifth frigate of Bangladesh Navy after BNS Hazrat Abu Bakar, BNS Hazrat Omar, BNS Hazrat Osman and BNS Hazrat Ali.

Navy sources said of the four old ones, three are already obsolete.

This is the first South Korean-built warship and the single-largest South Korean arms sale abroad, the 2,300-ton frigate has a year's warranty. What happens after that?(**Holiday, 22 June 2001)**

ফ্রিগেট বা নৌ জা বঙ্গবন্ধু'র কমিশনিং অনুষ্ঠান

সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব নয় রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলে মেয়াদ শেষের আগেই ফ্রিগেট সংগ্রহে সরকারের তৎপরতা

আবু রুশদ॥ দক্ষিন কোরিয়ার দেউলিয়া ঘোষিত শিল্প প্রতিষ্ঠান দেইয়্যু Daewoo কর্তৃক বাংলাদেশ নৌবাহিনীর জন্য প্রস্তুতকৃত ফ্রিগেট 'বা নৌ জা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'এ বছর মে মাসে বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করা হবে বলে জানা গেছে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই যাতে ফ্রিগেটটিকে নৌবাহিনীতে কমিশন দেয়া যায় বর্তমান সরকার তা যে কোন মুল্যে নিশ্চিত করতে চাইছে। তবে বিভিন্ন দেশের উপকরণ সংযুক্ত হওয়া 'বা নৌ জা বঙ্গ বন্ধু শেখ মুজিব' -এর ভবিষ্যৎ রক্ষণাবেক্ষন খুচরা যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতাসহ অপরাপর বিষয়ে অনিশ্চয়তা দেখা দিতে পারে-এ আশঙ্কা ব্যক্ত করে সংশিষ্ট পর্যবেক্ষণগণ জানিয়েছেন এই ফ্রিগেট ক্রয়ের ক্ষেত্রে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনের চেয়ে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিলেই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। তাদের মতে, ইতোপূর্বে আওয়ামী লীগ সশস্ত্র বাহিনী সম্পর্কে যেসব নেতিবাচক মনোভাব দেখিয়ে এসেছে মিগ ২৯ ও ফ্রিগেট এনে সেই 'দুর্নাম' কিছুটা হলেও তারা ঘোচাতে চাইছে। এজন্যই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই তারা 'বা নৌ জা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'কে নৌবাহিনীতে কমিশন প্রদানে উদগ্রীব। এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের শাসনামলে নৌবাহিনীতে একটি মিসাইল সজ্জিত ফ্রিগেট সংযুক্ত করতে চাচ্ছেন সরকারের শীর্ষ নেতৃবৃন্দ। অভিযোগ উঠেছে, একটি মিসাইল ফ্রিগেট হলেই হলো, ভবিষ্যতে এ নিয়ে কোন সমস্যার সৃষ্টি হবে কিনা সে ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ খুব একটা চিন্তিত নন। বিতর্কিত মিগ-২৯ -এর মতো 'আধুনিক' ফ্রিগেট এনেছি এমন আত্মতৃপ্তি বোধ ও এতদসংক্রান্ত প্রচারণাটাই সরকারের কাছে বড় কথা। তাই পৃথিবীর কোন নৌবাহিনীতে এক দেশের খোল, ইঞ্জিন ও অপর দেশের যুদ্ধাস্ত্র সংবলিত ফ্রিগের্ট না থাকলেও বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে এমন এক অদ্ভুত যুদ্ধজাহাজ সংযুক্ত হতে যাচ্ছে জনগণের শত শত কোটি টাকা ট্যাক্সের বিনিময়ে। বিশ্লেষকদের মতে, এটি যেন সত্যজিত রায়ের হাস ও সজারুর সংমিশ্রণে তৈরি 'হাসজারু' জাতীয় একটি কমব্যাট শিপ।

উল্লেখ্য, আলোচ্য ফ্রিগেটটির অবকাঠামো তৈরি করেছে দক্ষিণ কোরীয় প্রতিষ্ঠান দেইয়্যু, যেখানে এর ইঞ্জিন আনা হয়েছে জার্মানী ও ইংল্যান্ড থেকে। পাশাপাশি এর কামান বা আর্মামেন্টস সংযুক্ত করা হয়েছে সুইডেনের বোফর্স কোম্পানী, ইলেকট্রনিক্স সরঞ্জাম এসেছে জাপান থেকে ও মিসাইল এবং টর্পেডো সিস্টেম হিসেবে সংযুক্ত হয়েছে ইটালীর সরঞ্জাম। যদিও নৌবাহিনী সূত্র জানিয়েছে যে, প্রথমে ফ্রান্স, ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে মিসাইল ও টর্পেডো সিস্টেম চাওয়া হয়েছিল; কিন্তু তারা তা সরবরাহে রাজি না হওয়াতেই ইটালীর দ্বারস্থ হতে হয়। সূত্র আরো জানায় যে, সরঞ্জাম সংগ্রহ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বিভিন্ন দেশের কোম্পানীর সাথে পৃথক চুক্তি সম্পাদন করতে হয়েছে বাংলাদেশ সরকারের। সূত্র মতে, নিঃসন্দেহে সংশ্লিষ্ট যুদ্ধাস্ত্র ও সরঞ্জাম অত্যন্ত উঁচুমানের যা কেবলমাত্র একটি অত্যাধুনিক ফ্রিগেটেই আশা করা যায় এবং নিঃসন্দেহে 'বানৌজা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব'ই হতে যাচ্ছে বাংলাদেশের নৌবাহিনীর

ফ্রিগেট ফ্লিটের সবচেয়ে আধুনিক ফ্রিগেট। আবার এটাও অস্বীকার করার উপায় নেই যে, অনেক দেশই কোন যুদ্ধাস্ত্র তৈরির সময় বিভিন্ন দেশের উন্নত যন্ত্রাংশ তাতে সংযুক্ত করে থাকে যেমন করেছে পাকিস্তান। 'আল-খালিদ' মেইন ব্যাটল ট্যাঙ্ক তৈরির ক্ষেত্রে পাক বিশেষজ্ঞরা চীনের লাইসেন্সে যেমন যন্ত্রাংশ তৈরি করেছেন, তেমনি পাশ্চাত্যের ইলেকট্রানিক্স যন্ত্রপাতিও সংযুক্ত করেছেন দক্ষতার সাথে। তবে সংশ্লিষ্ট বিশ্লেষকগণ জানিয়েছেন, পাকিস্তান, ভারত বা অন্য কোন দেশ যাই তৈরি করুক তা তারা লাইসেন্সিং ভিত্তিতে নিজেরাই প্রস্তুত করে থাকে। সেক্ষেত্রে পরবর্তী রক্ষণাবেক্ষণ বা খুচরা যন্ত্রাংশের প্রাপ্যতা নিয়ে তাদের মাথা ঘামাতে হয় না। অথচ বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ তার উল্টো। এখানে হাইটেক যে কোন যুদ্ধ সরঞ্জামই সংগ্রহ করতে হয় বিদেশ থেকে। তাই সেসব সরঞ্জাম বা যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহে প্রথমেই সরবরাহকারীর বিশ্বস্ততা ও আন্তরিকতার দিকটি প্রথম দেখা উচিত বলে পর্যবেক্ষকদের অভিমত। এছাড়া ফ্রিগেট তৈরীর ক্ষেত্রে যেভাবে বিভিন্ন দেশের যন্ত্রাংশ সংযোজনের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে তা যে কোন মুহূর্তে বড় ধরনের অসুবিধা সৃষ্টি করতে পারে এমন আশঙ্কাও প্রকাশ করা হয়েছে একাধিক সূত্র থেকে। বলা হয়েছে, একটি যুদ্ধাস্ত্র বা যুদ্ধজাহাজে বিভিন্ন দেশের অত্যাধুনিক সরঞ্জামের হোমজিনিটি বা সমন্বয়সাধনই সবচেয়ে বড় কথা। এ ক্ষেত্রে বিশ্লেষকগণ ভারতের 'অর্জুন'-এর এর ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করে বলেছেন, ভারতীয় সমরবিদগণ এক সময় রাজনৈতিক চাপে অনেকটা বাধ্য হয়েই অর্জুন ট্যাঙ্ক প্রকল্পে হাত দিয়েছিলেন। তারা জানান দীর্ঘ প্রায় এক দশকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণার পর পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে অত্যাধুনিক সরঞ্জাম এনে এই অর্জুন ট্যাঙ্ক তৈরি করেছিলেন। কিন্তু মাঠ পর্যায়ের টেস্ট অ্যান্ড ট্রায়ালে গিয়ে দেখা যায়, 'অর্জুনের' 'বহুজাতিক' যন্ত্রপাতি সুসমন্বিতভাবে রি অ্যাক্ট করতে পারছে না। তাই বাধ্য হয়ে শত শত কোটি রুপীর এই অর্জুন প্রকল্প পরিত্যক্ত বলে ঘোষণা করে ভারতীয় সেনাবাহিনী। বাংলাদেশের ফ্রিগেটটির ভাগ্যেও যে এমনটি ঘটতে পারে, যে আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট সকলে এবং সবদিক পর্যালোচনা করে তারা এই ফ্রিগেট সংগ্রহের প্রচেষ্টাকে যতটা না 'সামরিক প্রজেক্ট' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন তারচেয়ে বেশি অখ্যায়িত করেছেন একটি 'রাজনৈতিক প্রকল্প' বলে।

এদিকে, দক্ষিণ কোরিয়ার দেইয়ু (Daewoo) কোম্পানী সে দেশের অন্যতম বৃহৎ মোটর গাড়ি ও জাহাজ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান হলেও সম্প্রতি এই কোম্পানী দেউলিয়া হয়ে গেছে বলে জানা যায়। এই কোম্পানীর দায়-দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে বা কোন কোম্পানী দেইয়ু কিনে নেবে কিনা তাও এখন নিশ্চিত নয়। বরং দক্ষিণ কোরিয়া সরকার এই কোম্পানীর হাজার হাজার শ্রমিকের তীব্র বিক্ষোভের মুখে বেশ বেকায়দায় পড়ে গেছে বলেই সিএনএন বিসিসিসহ অপরাপর সংবাদ মাধ্যমে প্রচারিত প্রতিবেদনে জানানো হয়েছে। প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সভাতেও এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেছেন সরকারী ও বিরোধীদলীয় সদস্যগণ। যদিও এই কমিটির একটি প্রতিনিধি দল গত ২৩ ফেব্রুয়ারী ২০০১ তারিখে দক্ষিণ কোরিয়া সফরে যান ফ্রিগেট-এর মহড়া দেখতে কিন্তু তারপরও সংশয়ে ভূগছেন সবাই। বিশেষ করে ইতিমধ্যে দেইয়ু কোম্পানীকে ফ্রিগেটের মূল্যের প্রায় ৮০ শতাংশ অর্থাৎ সাড়ে ৫০০ কোটি টাকা পরিশোধ করে দেয়ায় এই

দুশ্চিন্তার মাত্রা আরো বেড়েছে। এছাড়া ইলেকট্রনিক্স সামগ্রী, ইঞ্জিন ও কমব্যাট সিস্টেমের জন্য পৃথকভাবে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলোকে প্রায় আট মিলিয়ন ডলার প্রদানের কথাও জানিয়েছে সংশ্লিষ্ট সূত্র। এবাবে বিশাল অর্থ ব্যয়ে এবারই প্রথম একটি ফ্রিগেট সংগ্রহ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশ অনিচ্ছুক একজন অবসরপ্রাপ্ত নৌকর্মকর্তা। তিনি আরো জানান, বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে প্রথম ফ্রিগেট সংযুক্ত হয় ১৯৭৬ সালে। এটি ছিল ব্রিটিশ নেভীর SALLISBURY CLASS ফ্রিগেট যা বাংলাদেশ নৌবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত হয় 'বানৌজা ওমর ফারুক' নামে। পরবর্তীতে ১৯৭৭ সালে ঐ একই দেশের LEOPARD CLASS ফ্রিগেট নিয়ে এসে নামকরণ করা হয় 'বানৌজা আবুবকর' ও ১৯৮২ সালে একইভাবে কমিশনপ্রাপ্ত হয় 'বানৌজা আলী হায়দার'। এই তিনটি ফ্রিগেট ছিল ব্রিটিশ নৌবাহিনীর ব্যবহৃত জাহাজ যাতে মিসাইল সংযোজিত ছিল না। এরপর বাংলাদেশ নৌবাহিনীর প্রথম আধুনিক মিসাইল সজ্জিত ফ্রিগেট বানৌজা ওসমান সংযুক্ত হয় আশির দশকের শেষ দিকে যা ছিল চীনের তৈরি Jianghu-11 শ্রেণীর যুদ্ধজাহাজ তবে সম্প্রতি সংগৃতিব্য কোরিয়া ফ্রিগেট আধুনিক মিসাইলবাহী একটি যুদ্ধজাহাজ বলে জানা যায়। সূত্র মতে, বিএনএস ওসমান এর পর ফ্রিগেট সংগ্রহের এটিই প্রথম উদ্যোগ নয়। বরং তদানীন্তন বেগম খালেদা জিয়ার সরকার এ ব্যাপারে প্রথম উদ্যোগ গ্রহণ করেন। সে সময় রাশিয়ার কাছ থেকে ব্যবহৃত কিন্তু অত্যাধুনিক ফ্রিগেট তুলনামূলক অনেক কম দামে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল বলে জানা যায়। কিন্তু বিএনপি শাসনামলের শেষ দু'বছর দেশব্যাপী বিরোধী দল কর্তৃক সৃষ্ট অরাজকতার ফলে তখন ফ্রিগেট সংগ্রহের উদ্যোগে ভাটা পড়ে। পরবর্তীতে বর্তমান সরকার রাশিয়া থেকে রিকন্ডিশনড জাহাজ না কিনে নতুন ফ্রিগেট সংগ্রহের দিকেই ঝুঁকে পড়েন। অভিযোগ রয়েছে, ফ্রিগেট ছাড়া বাংলাদেশ নৌবাহিনীর শতকরা ৯০ ভাগ যুদ্ধজাহাজ চীনের তৈরি হলেও এ সরকার কম মূল্যে সে দেশের ফ্রিগেট সংগ্রহে অনীহা প্রকাশ করে। অথচ বর্তমানে যে মূল্যে কোরিয়া থেকে ফ্রিগেট সংগ্রহ করা হচ্ছে সে অর্থে চীন থেকে অন্তত দুটো উন্নতমানের মিসাইলবাহী ফ্রিগেট কেনা যেত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে।

যাহোক, দেইয়ু কোম্পানীর তৈরি ফ্রিগেট সঠিক সময়ে এসে বর্তমান সরকারের ভাবমূর্তি উন্নয়নে সহায়ক ভূমিকা পালনে সক্ষম হলেও এটি যে বাংলাদেশে নৌবাহিনীর জন্য ভবিষ্যতে ব্যাপক বিতর্কের সৃষ্টি করবে, সেটিই হতে পারে এই 'ফ্রিগেট কাহিনী'র সবচেয়ে বড় ট্রাজেডি।

(দৈনিক ইনকিলাব, ০৫/০৩/২০০১)

মিগ-২৯ এখন শুধুই কি শো পিস?

আবু রুশ্‌দঃ একাধিক যান্ত্রিক সমস্যা ও স্পেয়ার পার্টসের ঘাটতিজনিত কারণে বহু ঢাকঢোল পিটিয়ে সংগৃহীত মিগ-২৯ জঙ্গী বিমান বহর নিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী বেকায়দায় পড়তে বসেছে। বিমান বাহিনীর ৮ নম্বর স্কোয়াড্রন-এর অন্তর্ভুক্ত ৮টি মিগ-২৯ এর বেশীর ভাগই এখন প্রায় সময় গ্রাউন্ডেড অবস্থায় থাকায় এগুলো যুদ্ধ বিমান হিসেবে যতো না কার্যকর রয়েছে তার চেয়ে বেশী পরিণত হয়েছে শো পিস-এ। অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান সংগ্রহ করেছি ও এগুলো সব ঠিকঠাক আছে তা প্রমাণ করার জন্য বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ মাঝে মধ্যে ক'টি বিমান নিয়ে রুটিন ফ্লাইং-এর ব্যবস্থা করলেও অভিযোগ উঠেছে একটি মিগ-২৯ও এখন আর যুদ্ধোপযোগী অবস্থায় নেই। এই বিমানগুলোর মধ্যে রয়েছে ৩৭৫ ও ২৬৪ পরিচিত নম্বরের ২টি দুই আসনবিশিষ্ট ট্রেইনার যার মডেল হচ্ছে 'ইউ' (U) ও ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫ এবং ৫০৬ পরিচিতি নম্বরের ৬টি এক আসনবিশিষ্ট বিমান যার মডেল হলো 'বি' (B)। এ ব্যাপারে বিমান বাহিনী সংশ্লিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র জানায় যে, মিগ-২৯ জঙ্গী বিমানগুলোর প্রতিটিতেই ইঞ্জিন কুলিং ওয়েল পাইপের সমস্যা দেখা দেয়ায় এগুলোর উড্ডয়ন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে। সূত্র উল্লেখ করে গত বছর ১৬ ডিসেম্বরের পূর্ব পর্যন্ত এ সমস্যায় এক পর্যায়ে ৮টি মিগ-২৯ বিমানই গ্রাউন্ডেড হয়ে পড়ে। ইঞ্জিন কুলিং ওয়েল পাইপে সমস্যা দেখা দেয়ায় ইঞ্জিন প্রচন্ড গরম হয়ে যাওয়াতেই সে সময় বাধ্য হয়ে বিমানগুলোকে রানওয়েতে বসে থাকতে হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে। আরো জানা যায়, এ সমস্যার প্রেক্ষিতে তড়িঘড়ি করে রাশিয়া থেকে বিশেষজ্ঞ নিয়ে আসে বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ। কিন্তু তারা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে জানিয়ে দেয় পুরোপুরি কার্যক্ষমতা বা যুদ্ধোপযোগিতা ফিরে পেতে হলে ৮টি মিগ-২৯-এর ১৬টি ইঞ্জিনই বদলে নেয়া উচিত। সূত্র মতে, তা না হলে এই জঙ্গী বিমানগুলো যেমন হাইস্পীড ম্যানুভার করতে পারবে না তেমনি আফটার বার্নার ব্যবহারও বন্ধ রাখতে হবে বলে রাশিয়ান বিশেষজ্ঞ দল বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষকে সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেয়। মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে তারা আরও উল্লেখ করে যে, ইঞ্জিন পরিবর্তন না করলে বর্তমান যান্ত্রিক সমস্যা নিয়ে মিগ-২৯ বিমানগুলো যে কোন মুহূর্তে মারাত্মক দুর্ঘটনায় পতিত হতে পারে যার মাঝে আকাশে বিস্ফোরিত হবার সম্ভাবনাও রয়েছে। এক্ষেত্রে পাইলট ইজেক্ট করার সময় নাও পেতে পারেন বলে রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়েছে। জানা যায়, গত জানুয়ারীতে জিয়া বিমানবন্দরের রানওয়ে থেকে টেকঅফ-এর অব্যবহিত পর মুহূর্তে একটি এফটি-৭ প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হওয়ায় যে ধরনের ক্রটি সনাক্ত করা হয় ঠিক সে ধরনের দুর্ঘটনায় মিগ-২৯ বহর পড়তে পারে এমন আশঙ্কাই প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মহল। মূলত এ কারণেই এখন মিগ-২৯ খুব একটা বেশী উড়ছে না। যাও উড়ছে তা মাত্র ১০/১৫ মিনিটের জন্য নিতান্ত অস্তিত্ব জাহির করার লক্ষ্যে। এ পর্যায়ে সাম্প্রতিক পরিস্থিতি বিবেচনা করেই ডিজিডিপি অর্থাৎ প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর ২টি নতুন ইঞ্জিন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে টেন্ডার আহবান করেছে এবং অচিরেই আরও ২টি ইঞ্জিনের টেন্ডার আহবান করা হবে, যেখানে প্রতিটি নতুন ইঞ্জিনের দাম পড়বে প্রায় ১১ কোটি টাকা। এক্ষেত্রে যদি ৮টি বিমানের প্রতিটির দু'টি করে ইঞ্জিন পাল্টানোর জন্য মোট ১৬টি ইঞ্জিন

সংগ্রহ করতে হয় তাহলে খরচ পড়বে মোট ১৭৬ কোটি টাকার মত। এদিকে সংগ্রহের মাত্র বছর খানেকের মাথায় এসব 'অত্যাধুনিক' জঙ্গী বিমানে কেন এ ধরনের বড় ত্রুটি দেখা দিয়েছে তা বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ যথাসাধ্য গোপন করার চেষ্টা করলেও সংশ্লিষ্ট সূত্র থেকে জানা যায়, সংগৃহীত বিমানগুলোকে নতুন বলে চালিয়ে দেয়া হলেও এগুলো আসলে পুরনো বিমান। সূত্র মতে, গত শতকের নব্বই দশকের শুরুতে সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে যাওয়ার পর ১৯৯১ সালে উজবেকিস্তান রাশিয়া থেকে আলাদা হয়ে যায়। সে সময় উজবেকিস্তানে মোতায়েন মিগ-২৯ বিমান বহরে যে বিমানগুলো তুলনামূলক ভাল অবস্থানে ছিল সেগুলো নিয়ে যায় রাশিয়া। পরবর্তীতে অর্থনৈতিক সংকট থেকে উত্তরণের লক্ষ্যে এই বিমানগুলোই রাশিয়া তৃতীয় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে কম মূল্যে বিক্রি শুরু করে। আরও জানা যায়, গত শতকে আশির দশকে মার্কিন এফ-১৬ জঙ্গী বিমানের কাউন্টার পার্ট হিসেবে মিগ-২৯ বানালেও সোভিয়েত রাশিয়া ভেঙ্গে যাওয়ার পর রাশিয়ায় নতুন করে কোন মিগ-২৯ তৈরী করা হয়নি। এ কারণেই ১৯৯৭/৯৮ সালে রাশিয়া পাকিস্তান বিমন বাহিনীকে আকর্ষণীয় অফার দিলেও পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষ মিগ-২৯ ক্রয়ে অনাগ্রহ প্রকাশ করে ও 'এসইউ-৩০' যুদ্ধ বিমান বিক্রয়ের জন্য রাশিয়াকে অনুরোধ জানায়। একইভাবে রাশিয়া ইরানসহ মধ্যপ্রাচ্যের ক'টি দেশের কাছেও অনেক চেষ্টা করে মিগ-২৯ বিক্রিতে ব্যর্থ হয়। তাই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী তড়িঘড়ি করে ক্রয়চুক্তির মাত্র ৬ মাসের মাথায় যে ৮টি মিগ-২৯ সংগ্রহ করে সেগুলোও কোনভাবেই নতুন হতে পারে না বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞগণ অভিমত প্রকাশ করেছেন।

কারণ তাদের মতে, ক্রয়চুক্তির মাত্র ৬ মাসের মধ্যে নতুন বিমান তৈরী করে সরবরাহ দেয়া সম্ভব নয়। তার উপর এই বিমানগুলো যুদ্ধ মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ইলেকট্রনিক্স ও এভিয়নিক্স ছাড়া সংগ্রহের যথেষ্ট অভিযোগ রয়েছে। এক্ষেত্রে তথাকথিত 'কম মূল্য' অর্থাৎ ১২ কোটি ৪০ লাখ মার্কিন ডলারে ৮টি মিগ সংগ্রহের কথা বলে জনগণকে বোকা বানানো হয়েছে ঠিকই কিন্তু এই 'মূল্যে' কিনতে গিয়েই বিপত্তির সৃষ্টি হয়েছে- এমন অভিমত প্রকাশ করেছেন বিমান বাহিনীর একাধিক সূত্র। তারা বলেছেন যদি বিশ্ব বাজারে প্রচলিত মূল্যে অর্থাৎ প্রতিটি মিগ-২৯ বিমান ২ কোটি ৫০ লাখ মার্কিন ডলার মূল্যে ক্রয় করা হতো তাহলে হয়তো সংগৃহীত বিমানগুলোর চেয়ে অনেক কার্যকর বিমান ক্রয় করা যেতো। অবশ্য সরকার সশস্ত্র বাহিনীকে আধুনিকায়নে দৃঢ় সংকল্প এমন রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির লক্ষ্যে কম দামে অতি দ্রুত মিগ-২৯ সংগ্রহ করলেও 'সাইড লাইনে' এগুলোর রক্ষণাবেক্ষণ খাতে ঠিকই বরাদ্দ রাখা হয়েছে অতিরিক্ত ৩ কোটি ৬০ লাখ মার্কিন ডলার। কিন্তু রক্ষণাবেক্ষণের বাইরে আর্মামেন্টস, এভিয়নিক্স, ইলেকট্রনিক্স সংগ্রহ করে আদৌ মিগ-২৯ বিমান বহরকে প্রকৃত যুদ্ধ বিমানে পরিণত করা হবে কিনা তা নিয়ে সুস্পষ্ট কোন দিক-নির্দেশনা এ যাবত পাওয়া যায়নি। এবং এসব ব্যয়বহুল ব্যবস্থাদি কত অর্থের বিনিময়ে ও কোন সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ থেকে সংগ্রহ করা হবে সেটিও কেউ বলতে পারছে না।

উল্লেখিত সমস্যার পাশাপাশি আরও জানা গেছে, মিগ-২৯ বিমান ক্রয়ের সময় যথেষ্ট পরিমাণ ড্র্যাগ স্যুটও কেনা হয়নি। সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, দ্রুতগতিসম্পন্ন জঙ্গী

বিমান ল্যান্ড করার সময় গতি নিয়ন্ত্রণে এসব ড্র্যাগ স্যুট 'অতি প্রয়োজনীয়' হলেও এখন এর স্বল্পতার কারণে পাইলটদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে ড্র্যাগস্যুট ছাড়া শুধু ব্রেক দিয়ে গতি নিয়ন্ত্রণের জন্য। ফলে ব্রেক সিস্টেমের উপর অত্যধিক চাপ পড়ে তা বিকল হয়ে যাবার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে যা মেরামত করতে বা বদলাতে প্রয়োজন হবে কোটি কোটি টাকার। শুধু তাই নয়, বিমান স্কিড অফ করা বা ব্যারিয়ার ভেদ করে দুর্ঘটনায় পতিত হওয়ার ঝুঁকিও প্রতি মুহূর্তে সৃষ্টি হচ্ছে বলে সূত্র উল্লেখ করেছে। এদিকে একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে যে, সরকার মিগ-২৯ সংগ্রহকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এফ-১৬ জঙ্গী বিমান সরবরাহে অপারগতা প্রকাশ করেছে বলে যে 'এ্যালিবাই' সৃষ্টি করা হয়েছিল তা মোটেও সত্য নয়। এ ব্যাপারে সূত্র জানায়, সে সময় যুক্তরাষ্ট্র ২০ ভাগ ব্যবহৃত ৮০ ভাগ নতুন এফ-১৬ জঙ্গী বিমান প্রতিটি ১ কোটি ডলারে সরবরাহ করার প্রস্তাব দিয়েছিল। কিন্তু কমিশন সংক্রান্ত বিষয় 'চিন্তা' করে যুক্তরাষ্ট্রের সংশ্লিষ্ট কোম্পানীকে দাম উল্লেখ করতে বলা হয়েছিল ১ কোটি ২০ লাখ ডলার যা মার্কিন কর্তৃপক্ষ সঙ্গত কারণেই বাতিল করে দেয়। পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন চ্যানেল মেইনটেইন করে বাংলাদেশে এসে পৌঁছায় বিতর্কিত মিগ-২৯। মজার ব্যাপার হচ্ছে ভারত বাংলাদেশের সমরাস্ত্র সংগ্রহ নিয়ে সব সময় উচ্চকিত থাকলেও এক্ষেত্রে 'কেন জানি' চুপচাপ ভূমিকা পালন করে। যা হোক, সার্বিক পর্যালোচনায় বলা যায়, মিগ-২৯ অত্যন্ত দ্রুতগতির উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ফাইটার ইন্টারসেপ্টর যা পারমাণবিক অস্ত্র বহনের ক্ষমতা রাখে সত্য; কিন্তু তার এসব ক্ষমতার কার্যকর বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রয়োজনীয় আর্মামেন্টস, এভিয়নিক্স সংযুক্ত থাকাটাই হচ্ছে মুখ্য বিষয়। এছাড়া ক্রটিমুক্ত থাকার উপরও নির্ভর করছে অনেক কিছু। এগুলো ছাড়া মিগ-২৯ শুধু নামেই মিগ-২৯, যা রাজনৈতিক প্রপাগান্ডার মোক্ষম হাতিয়ার হলেও বাস্তবের শো-পিস বৈ কিছুই নয়। **(দৈনিক ইনকিলাব ২০০১)**

বাংলাদেশের অর্ধেক দামে কিনেছে বার্মা মিগ-২৯ কেলেঙ্কারির কেচ্ছা

আলী মাহমুদঃ প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমার (সার্বেক বার্মা) সম্প্রতি রাশিয়া থেকে ৮টি মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান কিনেছে। প্রতিটি এই মিগের দাম পড়েছে মার্কিন ডলার ১০ মিলিয়ন করে। অথচ একই মিগ-২৯ যুদ্ধবিমান শেখ হাসিনা সরকার কিনেছিল ১৮ দশমিক ৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যে। উল্লেখ্য, ১৯৯৯ সালের বিতর্কিত এই যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের সময় দেশ জুড়ে ব্যাপক প্রতিবাদের ঝড় উঠলেও তৎকালীন সরকার এই যুদ্ধ বিমান ক্রয় থেকে বিরত হয়নি। বরং শেখ হাসিনা বলেছিলেন- এই উড়োজাহাজ অনেক কম দামে আমরা কিনতে সক্ষম হয়েছি। এদিকে জানা গেছে, একটি প্যাকেজ ডিলে ৮টি মিগ-২৯ ক্রয় করা হয়। শেখ হাসিনা আরো ৮টি মিগ-২৯ কিনতে আগ্রহী ছিলেন। ১৬টি মিগ-২৯ নিয়েই একটি বিশেষ বাহিনী গড়ার পরিকল্পনা রয়েছে, যা সম্পূর্ণভাবেই হবে ভারত নির্ভরশীল। কারণ এই মিগ-২৯ এর যন্ত্রাংশসহ অন্যান্য সার্ভিস ভারত থেকে গ্রহণ করতে হবে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের এই ৮টি মিগ-২৯ ক্রয়ের সময় বিমান বাহিনী প্রধান ছিলেন জামাল উদ্দিন আহমদ। এদিকে এক অভিযোগে জানা গেছে, বেশি দামে মিগ-২৯ ক্রয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট সরকার প্রধান মোটা অংকের

অর্থ বাগিয়েছেন। এ ব্যাপারটি প্রতিরক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটিতে দীর্ঘদিন ধরে আলোচনা ও বাদ-প্রতিবাদ সত্ত্বেও শেখ হাসিনা সরকার এটি ক্রয় থেকে বিরত হয়নি। এ ব্যাপারে বিএনপির সাবেক সংসদ সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান এই স্থায়ী কমিটিতে খুবই প্রতিবাদমুখর ভূমিকা পালন করেন।

গতকাল শনিবার তার সঙ্গে টেলিফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান যে, মিগ-২৯ কিনে এর প্রশিক্ষণ চালাতে গিয়ে বেহাল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। আমরা তখন এই ব্যাপারে দেশের স্বার্থে সৎ পরামর্শ দিয়েছিলাম- তৎকালীন সরকার তা গ্রহণ করেনি। বর্তমান তত্ত্বাবধায়ক সরকার বিষয়টি খতিয়ে দেখতে পারে। **(দৈনিক দিনকাল ৯/৯/২০০১)**

শেখ হাসিনা, বিমানবাহিনী প্রধান ও রাশিয়ায় সামরিক এ্যাটাশে জড়িত

মিগ-২৯ ক্রয় করে সাড়ে ৩শ' কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার

সংগ্রাম রিপোর্টঃ বিমান বাহিনীর জন্য ৮টি মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান ক্রয় করে সাবেক আওয়ামী লীগ সরকার সাড়ে ৩শ' কোটি টাকার বেশী আত্মসাৎ করেছে। একটি নির্ভরযোগ্য সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিটি মিগ-২৯ বিমান ক্রয় করেছে ১৮ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলারে। সমসাময়িককালে মায়ানমার সরকার রাশিয়া থেকে একই যুদ্ধ বিমান ক্রয় করেছে ১০ মিলিয়ন ডলারে। অর্থাৎ আওয়ামী লীগ সরকার প্রতিটি যুদ্ধ বিমান বাবদ ৭ দশমিক ৫ মিলিয়ন ডলার বেশী প্রদান করেছে। এই বিমান ক্রয় থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ কমিশন বাবদ লাভ কছে।

সূত্র জানায়, ১৯৯৯ সালে এই ৮টি মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের সাথে রাশিয়ায় নিযুক্ত বাংলাদেশের তৎকালীন ডিফেন্স এ্যাটাশে এবং বিমান বাহিনী প্রধান মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। এই ২ জনই সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তিনি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন। মিগ-২৯ যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের পর দেশে ব্যাপক বিতর্ক শুরু হলে সরকারীভাবে জানানো হয় প্রতিটি মিগ ১০ মিলিয়ন ডলারে ক্রয় করা হয়েছে। প্রকৃত পক্ষে ৮টি মিগ-২৯ বিমান ক্রয় করতে ৬০ মিলিয়ন ডলার বা সাড়ে ৩শ' কোটি টাকার বেশী প্রদান করা হয়েছে। এই বিমান ক্রয় করতে আওয়ামী লীগ পন্থী কয়েকজন সাবেক সেনা কর্মকর্তা ও ব্যবসায়ী মধ্যস্বত্ব ভোগী হিসাবে বিপুল অর্থ কামিয়েছেন।

রাশিয়ার কাছ থেকে এই যুদ্ধ বিমান ক্রয়ের ক্ষেত্রে আরেকটি শর্ত ছিলো বিমানগুলোর খুচরা যন্ত্রাংশ (স্পেয়ার পার্টস) ক্রয় করতে হবে ভারত থেকে। কার্যত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা ভারতনির্ভর করতে এই বিমানগুলো ক্রয় করা হয়। অত্যন্ত ব্যয়বহুল ক্ষণভঙ্গুর এই যুদ্ধ বিমানগুলো বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় তেমন

কোন ভূমিকা রাখবে না বলে সামরিক বিশেষজ্ঞরা বলছেন। সাবেক সমাজতান্ত্রিক বলয়ের কয়েকটি দেশ এই যুদ্ধ বিমান ব্যবহার করতো।

বিমান বাহিনীর স্পেশাল ফ্লাইং ইউনিটে এত পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি?

বিমান নেই অথচ রয়েছে ১ এয়ার কমোডর ৩ গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও ২৫ উইং কমান্ডার

আবু রুশদঃ বিমান বরাদ্দ নেই কিন্তু একজন এয়ার কমোডরকে ঠিকই নিয়োগ দেয়া হয়েছে কমান্ডিং অফিসার হিসেবে। আরো রয়েছেন ৩ জন গ্রুপ ক্যাপ্টেন, ২৫ জন উইং কমান্ডারসহ একাধিক কর্মকর্তা। এরা সকলেই বিমান বাহিনীর পরিবহন বিমান চালক। ভিআইপিদের বহনের উদ্দেশ্যে গঠিত 'স্পেশাল ফ্লাইং ইউনিটে' এসব কর্মকর্তাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে সাবেক বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) জামালউদ্দিন আহমেদ-এর সময়কালে। অথচ, এখনো এই ইউনিটের নিজস্ব কোন পরিবহন বিমান নেই। প্রয়োজন মুহূর্তে ৩ নম্বর স্কোয়াড্রনের একটি 'এএন-৩২' (ট্রান্সপোর্ট) বিমান এনে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন বিমান বাহিনী কর্তৃপক্ষ। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিমান বাহিনী প্রধান 'স্পেশাল ফ্লাইং ইউনিট' গঠনের নামে তদানীন্তন সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে দেনদরবার করে একটি ইউনিটে উল্লিখিত বিপুলসংখ্যক পরিবহন পাইলটের নতুন পদ সৃষ্টিতে সফলকাম হন। মূলত তারই সুপারিশক্রমে সরকার বিমান না থাকার পরও একজন এয়ার কমোডরকে ওই ইউনিটের অধিনায়ক হিসেবে দেখিয়ে প্রয়োজনীয় সাংগঠনিক ছক বা টিওএন্ডই অনুমোদন করে। সূত্র মতে, বাংলাদেশ বিমানবাহিনী তো বটেই, পৃথিবীর অপরাপর এয়ারফোর্সেও এমন একটি ইউনিটকে কমান্ড করার জন্য ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদমর্যাদার একজন এয়ার কমোডর নিয়োগের নজির নেই। এছাড়া উল্লিখিত ইউনিট যা বিমানবাহিনীর কোন 'ফাইটিং টিথ' নয়, সেখানে কর্নেল পদমর্যাদার ৩ জন গ্রুপ ক্যাপ্টেন ও লে. কর্নেল পদমর্যাদার ২৫ জন উইং কমান্ডারের পদ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি তা নিয়েও সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে বলে সূত্র উল্লেখ করেছে। সূত্র মতে, এক্ষেত্রে পরিবহন বিমানচালকের প্রমোশন ত্বরান্বিত করা ও সংখ্যা বাড়ানোর জন্যই এ জাতীয় পদক্ষেপ নেয়া হয় সাবেক বিমানবাহিনী প্রধানের ব্যক্তিগত আগ্রহে। অথচ একই সাথে বিমান বাহিনীর সবচেয়ে ব্যয়বহুল ও অত্যাধুনিক মিগ-২৯ জঙ্গি বিমান বহর অর্থাৎ ৮ নং স্কোয়াড্রনের অধিনায়ক পদে রয়েছেন একজন উইং কমান্ডার পদমর্যাদার কর্মকর্তা। বিমানবাহিনীর অন্যান্য স্কোয়াড্রনের অবস্থাও অনেকটা একইরূপ। আরও জানা যায়, আকাশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা অর্থাৎ রাডার স্থাপনাগুলো দিনরাত ২৪ ঘন্টা চালু রাখার মত জনবলেরও অভাব রয়েছে বিমানবাহিনীতে। কিন্তু দেশের আকাশ প্রতিরক্ষায় প্রয়োজনীয় এসব খাতে নজর দেয়া না হলেও 'বিমানবিহীন পরিবহন বহরের' জন্য খুলে দেয়া হয়েছে সম্ভাবনার অবারিত দ্বার। উল্লেখ্য, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বিমানবাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল (অব.) জামালউদ্দিন আহমেদ একজন পরিবহন বিমানচালক এবং তিনি দীর্ঘ প্রায় ৬ বছর বাংলাদেশ এয়ারফোর্সকে কমান্ড করেছেন।**(দৈনিক ইনকিলাব, ২৪/৬/২০০১)**

পরিবহন পাইলটকে বিমানবাহিনী প্রধান নিয়োগে তদ্বির অব্যাহত

সি-১৩০ বিমান সংগ্রহ প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ

আবু রুশ্‌দঃ বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমদ-এর চাকুরীর মেয়াদ প্রায় শেষ হয়ে এলেও তিনি মিগ-২৯ প্রসঙ্গের পাশাপাশি আরো বেশ ক'টি বিতর্কিত ইস্যুতে জড়িয়ে পড়েছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। পছন্দনীয় একজন পরিবহন বিমান পাইলটকে পরবর্তী বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দানে তদ্বির করায় যেমন তিনি জড়িয়ে গেছেন, তেমনি সাম্প্রতিক সি-১৩০ ট্রান্সপোর্ট বিমান সংগ্রহ প্রক্রিয়া নিয়েও সৃষ্টি করেছেন বিতর্কের। এ ব্যাপারে বিমানবাহিনী সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র জানায় যে, শত সমালোচনার পরও বিমনবাহিনী প্রধান নিজে একজন পরিবহন বিমান পাইলট হিসেবে পরবর্তী বিমানবাহিনী প্রধান নিয়োগদানের ক্ষেত্রে একজন পরিবহন বিমান চালককে মনোনীত করায় সরকারী শীর্ষ মহলে তদ্বির চালিয়ে যাচ্ছেন। এ পর্যায়ে তিনি সম্ভাব্য ফাইটার পাইলটদের অনেককেই প্রধানমন্ত্রীর কাছে নেতিবাচকভাবে চিত্রিত করছেন বলে সূত্র জানিয়েছে। উল্লেখিত যোগ্য ফাইটার পাইলটদের মধ্য থেকে যাতে কেউ বিমানবাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ না পেতে পারেন সেজন্য তিনি শীর্ষ মহলের কান ভারী করায় ন্যূনতম কোন বিরতি দিচ্ছেন না। অথচ সূত্র মতে অপরকে বিভিন্ন 'পন্থী' হিসেবে চিহ্নিত করলেও মুক্তিযুদ্ধকালীন এভিএম জামাল উদ্দিনের ভূমিকা নিয়ে বিস্তর বিতর্কের অবকাশ রয়েছে। এ প্রসঙ্গে সূত্র উল্লেখ করেছে, বিমানবাহিনী প্রধান তার অপছন্দনীয় কিন্তু একাধিক যোগ্য ফাইটার পাইলটের দেশপ্রেম নিয়ে প্রায়ই প্রধানমন্ত্রীর সাথে কথা বলে থাকেন, যেখানে তিনি ঐসব কর্মকর্তাকে সঠিক অর্থে দেশপ্রেমিক নয় বলে কানভারী করে চলেছেন সরকার প্রধানের। অথচ, সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, এভিএম জামাল উদ্দিন ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধকালীন পাক বিমানবাহিনীর একজন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট হিসাবে লিবিয়ায় ডেপুটেশনে নিয়োজিত ছিলেন। যথেষ্ট সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তিনি যেমন লিবিয়া থেকে পক্ষ ত্যাগ করে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেননি তেমনি ১৬ ডিসেম্বর ১৯৭১-এ দেশ স্বাধীন হওয়ার পরও সরাসরি বাংলাদেশে ফিরে আসেননি। উল্টো পাকিস্তানের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করে তিনি ইসলামাবাদে ফিরে যান ও তার প্রাপ্য সব বেতন-ভাতা গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে একজন রি-প্যাট্রিয়েটেড অফিসার হিসেবে তদানীন্তন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট জামালউদ্দিন বালাদেশে ফিরে আসেন ১৯৭৩ সালে। অথচ তারই সমসাময়িক তদানীন্তন ফ্লাইট লে. শওকতুল ইসলাম তুরস্ক থেকে লন্ডন চলে যান ও ফিরে আসেন বাংলাদেশে। এভাবে নিজে একজন পাকিস্তান প্রত্যাগত কর্মকর্তা হয়েও তিনি বর্তমানে পরবর্তী বিমান বাহিনী প্রধান পদে তার পছন্দনীয় প্রার্থীর সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বিতার বিরুদ্ধে চালিয়ে যাচ্ছেন অঘোষিত যুদ্ধ। ফলে আগামী ৪ জুন ২০০১ তারিখে এভিএম জামাল উদ্দিনের চাকরির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে আদৌ কোন জঙ্গি বিমান চালক বিমান বাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ পাবেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। এর পাশাপাশি বিমান বাহিনী প্রধান বর্তমানে বিমান বাহিনীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে পরিবহন স্কোয়াড্রন অর্থাৎ ৩ নং স্কোয়াড্রনের অন্তর্ভুক্ত পরিবহন পাইলটদের নিয়োগ দিয়েছেন বলেও বিমান বাহিনী সূত্র উল্লেখ করেছে। জানা গেছে, ডিরেক্টর-ইন্টেলিজেন্স

(এয়ার উইং), ডিরেক্টর ট্রেনিং, মেম্বার অপারেশন ও ওসি এয়ার হেডকোয়ার্টার ইউনিটের মত উল্লেখযোগ্য পদে এখন যেসব অফিসার কর্মরত রয়েছেন তাদের সকলেই বিমান বাহিনী প্রধানের প্যারেন্ট ইউনিট ৩ নং স্কোয়াড্রনের কর্মকর্তা। এছাড়া তার পিএসও ঐ একই স্কোয়াড্রনের কর্মকর্তা।

এদিকে বিমান বাহিনী প্রধানের পুত্র যিনি ২৫ নভেম্বর ১৯৯৯ তারিখে কমিশন প্রাপ্ত হন তাকেও নিয়োগ দেয়া হয়েছে ৩নং স্কোয়াড্রনে। ৪০তম জিডিপি শর্ট কোর্সের এই কর্মকর্তা এখন পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করে একজন পরিবহন পাইলটে পরিণত হয়েছেন। সূত্র মতে, এটা দোষের কিছু না হলেও সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যে চারটি সি-১৩০ পরিবহন বিমান সংগ্রহ করা হচ্ছে সেগুলোর প্রকিউরমেন্ট প্রক্রিয়ার সাথেও জুড়ে দেয়া হয়েছে এভিএম জামালউদ্দিনের পুত্রকে, যে একজন জুনিয়র ফ্লাইং অফিসার হলেও এখন বাংলাদেশ-আমেরিকা-বাংলাদেশ 'ট্যুর' করছেন হরহামেশা।
অন্যদিকে সি-১৩০ বিমান সংগ্রহ প্রক্রিয়া সম্পর্কেও অভিযোগ পাওয়া গেছে বিমান বাহিনী সূত্র থেকে। জানা গেছে, যে বিমানগুলো আনা হচ্ছে সেগুলো ফার্স্ট জেনারেশন সি-১৩০ হারকিউলিস যা এখন পৃথিবীর কোন মানসম্পন্ন বিমান বাহিনীতেই ব্যবহার করা হয় না। যেগুলো মার্কিন ও পাকিস্তান বিমান বাহিনীসহ অপরাপর এয়ার ফোর্সে ব্যবহার করা হয় সেগুলো অনেক আধুনিক মডেলের সি-১৩০ বিমান। অথচ বাংলাদেশ যেগুলো আনছে সেগুলো প্রোটোটাইপ এবং এই বিমনগুলো আধুনিক ইলেকট্রনিক্স ও অন্যান্য মানদণ্ডে আপটু ডেট না হওয়ায় এগুলোর বেশ কিছু পরিবর্তন, পরিবর্ধনের ব্যবস্থা নিতে হয়েছে বিমান বাহিনীকে। সূত্র মতে, ইতোমধ্যেই সি-১৩০ বিমানগুলো Refurbish করতে প্রায় ১৫০ কোটি টাকা খরচ করে ওইসব বিমানের হাইড্রোলিক সিস্টেম, এয়ারফ্রেম ও ককপিটে অদল-বদল করতে হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থাপনায়। কিন্তু তারপরও এই পুরনো মডেলের বিমানগুলো কতটুকু সার্ভিস দেবে তা নিয়ে রয়েছে বিস্তর সন্দেহ এবং এ প্রশ্নের কোন উত্তর সম্ভবত সাম্প্রতিক বাংলাদেশ ও এর বিমান বাহিনী প্রশাসনে পাওয়া যাবে না বলেই পর্যবেক্ষকদের ধারণা। **(দৈনিক ইনকিলাব, ৬/৫/০১)**

বিনামূল্যে সংগ্রহের কথা বলা হলেও ইতোমধ্যে খরচ হয়ে গেছে ১৮০ কোটি টাকা

মিগ-২৯-এর পর অর্ধশতাব্দীর পুরোনো সি-১৩০ বি বিমানের নামে আরেক শ্বেতহস্তী ঢুকছে বিমান বহরে

মিগ-২৯ জঙ্গী বিমানের পর এবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে সংগৃহীতব্য সি-১৩০ 'হারকিউলিস' পরিবহন বিমান বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য আরেক 'শ্বেতহস্তী'তে পরিণত হতে চলেছে। প্রায় অর্ধশতাব্দীর পুরনো এই বিমানগুলোর সংগ্রহ প্রক্রিয়া, ওভারহলিং নিয়ে পাওয়া গেছে দুর্নীতি, অনিয়মের একাধিক অভিযোগ। বিমানবাহিনী সংশ্লিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র জানিয়েছে, ব্যক্তিস্বার্থ ও অপকীর্তি আড়াল করার লক্ষ্যে সি-১৩০ পরিবহন বিমান যুক্তরাষ্ট্র থেকে বিনামূল্যে সংগ্রহের খবর ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা হলেও এখন এই অতি পুরনো বিমানগুলো কার্যক্ষম করে তোলায় মিলিয়ন

মিলিয়ন ডলার ব্যয় করা হচ্ছে। জানা গেছে, ওভারহলিং এর নামে সংগৃহীতব্য ৪টি সি-৩০ 'হারকিউলিস' পরিবহন বিমানের জন্য ইতিমধ্যেই ৩১ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ১শ' ৭৬ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। কিন্তু এরপরও এই বিমানগুলোকে পরিপূর্ণরূপে সচল করা যায়নি। তাই গত বছর অক্টোবরে ৪টি 'হারকিউলিস' এর বাংলাদেশে পৌঁছার সিডিউল টাইমও ঠিক রাখতে পারেনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এছাড়া এই বিমানগুলোকে সুসজ্জিত ও কার্যক্ষম করায় আরও কত মিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে এবং আর কত সময়ের প্রয়োজন হবে, তাও এখন পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে কেউ বলতে পারছে না। এ কারণে বর্তমান আ'লীগ সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন এই ৪টি সি-১৩০ বিমান নিয়ে যে নতুন পরিবহন স্কোয়াড্রন গঠন ও এর উদ্বোধনের কথা ছিল তাও অনেকটা অনিশ্চিত হয়ে উঠেছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্র আরও জানায়, সদ্য অবসরপ্রাপ্ত পরিবহন বিমান চালক এয়ার মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমদ-এর সুপারিশক্রমে আ'লীগ সরকার এক সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের 'লকহীড' কোম্পানীর তৈরী ৪টি সি-১৩০ পরিবহন বিমান সংগ্রহে উদ্যোগী হয়। সে সময় বলা হয়েছিল যুক্তরাষ্ট্র এই বিমানগুলো সরবরাহ করবে বিনামূল্যে এবং এগুলোর ওভারহলিং-এ বিমান পিছু খরচ হবে মাত্র ৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৪টি বিমানের জন্য সর্বমোট ১২ মিলিয়ন ডলার, টাকার অংকে যার পরিমাণ ধরা হয় ৬৮ কোটি ৪০ লাখ টাকা। এ প্রেক্ষিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সামরিক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্যই হোক বা বিনামূল্যে পাওয়ার লোভেই হোক সরকার রাজি হয়ে যায় বিমান বাহিনীর পরিবহন বহরে 'হারকিউলিস' বিমান সংযুক্তির জন্য। কিন্তু যতই দিন যাচ্ছে ততই বিনামূল্যে ও 'হারকিউলিস'-এর মত বিমান সংগ্রহের টোপ ফেলার উদ্দেশ্য কি ছিল, তা সবার কাছে পরিষ্কার হয়ে উঠছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সি-১৩০ যা 'হারকিউলিস' নামে বিশ্বব্যাপী পরিচিত তা একটি অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য ও উন্নত পরিবহন বিমান হলেও বাংলাদেশ যে মডেলের সি-১৩০ সংগ্রহ করছে তা প্রায় ৪০ থেকে ৪৫ বছরের পুরনো। সূত্র মতে, উল্লেখিত সি-১৩০ বিমানগুলো 'বি' মডেলের, যা এই সিরিজে ফার্স্ট জেনারেশন বিমান এবং বর্তমানে পৃথিবীর কোন বিমান বাহিনীতেই 'বি' মডেলের সি-১৩০ ব্যবহার করার কোন নজির নেই। এছাড়া যেখানে মার্কিন বিমান বাহিনীতে 'জে' মডেলসহ মিসর, ইসরাইল, তুরস্ক, হল্যান্ড ও পাকিস্তানের মত দেশে 'এইচ' মডেলের সি-১৩০ ব্যবহার করা হচ্ছে সেখানে বাংলাদেশ কেন ষাট দশকের শুরুতে তৈরী 'বি' মডেল সংগ্রহ করেছে, তার হিসাব কোন সূত্রেই মিলানো সম্ভব নয়। সূত্র জানায়, 'বি' মডেলের এই সি-১৩০ বিমানগুলো দীর্ঘদিন ব্যবহারের পর এর পরিচালন ব্যয় অত্যধিক বেড়ে যাওয়ায় মার্কিন বিমান বাহিনী সত্তর দশকের শুরুতে এগুলোকে গ্রাউন্ডেড করে দেয়। এরপর থেকে এগুলো পরিত্যক্ত অবস্থাতেই ছিল। এছাড়া এর চেয়ে অনেক আধুনিক ও যুগোপযোগী মডেলের সি-১৩০ তৈরী হওয়ার কারণেও মার্কিন বিমান বাহিনী উল্লেখিত বিমানগুলো ব্যবহারে উৎসাহ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত কারণে, সম্ভবত কোন কমিশন এজেন্টকে কিছু 'নগদ' পাইয়ে দেয়ার জন্য বাংলাদেশ এগুলো সংযুক্ত করতে যাচ্ছে 'বিনামূল্যে পাচ্ছি' এ জাতীয় চটকদার কথা বলে। অথচ সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী এখন ৩১ মিলিয়ন ডলার

ব্যয় করে যেখানে সি-১৩০ বহরকে উড্ডয়নক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হচ্ছে সেখানে ঐ অর্থ দিয়ে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে বর্তমানে ব্যবহৃত 'এএন-৩২'র এর মত ৮ থেকে ১০টি নতুন পরিবহন বিমান সংগ্রহ করা যেত। এতে একদিকে যেমন নতুন বিমান পাওয়া যেতো তেমনি এগুলোর পরিচালন ব্যয়ও হত তুলনামূলক অনেক কম। অথচ এখন যে 'সি-১৩০ বি' বিমান সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলোর পরিচালন ব্যয় হবে অত্যধিক বেশী। এমনকি এই পুরনো বিমানগুলোকে ট্রেনিং বা মহড়ার জন্য আকাশে ওড়ালেও যে পরিমাণ ফুয়েল প্রয়োজন হবে তা সমগ্র বিমান বাহিনীর চাহিদার চেয়েও বেশী হবে বলে সূত্র উল্লেখ করে। সূত্র মতে, একই সাথে এই ওভারহলিংকৃত বিমান বহরকে উড্ডয়নক্ষম রাখার জন্য স্পেয়ার পার্টস, রর্ক্ষণাবেক্ষণ খাতে আরও কোটি কোটি টাকা সরকারকে খরচ করতে হবে। এর ফলে অচিরেই 'হারকিউলিস' বহর পরিণত হবে এক নতুন শ্বেতহস্তীতে, যা বিমান বাহিনীর ঘাড়ে চেপে বসবে সিন্দাবাদের ভূতের মত। দরিদ্র এই দেশের ততোধিক দরিদ্র বিমান বাহিনী না পারবে একে চালাতে, না পারবে ফেলে দিতে। কিন্তু তারপরও 'হারকিউলিস' সংগ্রহ করা হয়েছে। ব্যয় করা হয়েছে জনগণের ট্যাক্সের শত কোটি টাকা এবং সম্ভবত আরও ব্যয় করতে হবে এগুলোকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে বাংলাদেশে উড়িয়ে আনার জন্য। অবশ্য নির্ধারিত সময়ের ৬ মাস পার হয়ে গেলেও কখন সি-১৩০ আসবে তা প্ররোচনাদানকারী ও কমিশন খেকো মহল জানলেও জনগণের পক্ষে এখনও জানা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। **(দৈনিক ইনকিলাব, ২০০১ ইং সালে প্রকাশিত)**

এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল উদ্দিন বাইপাস সার্জারী করেও তথ্য গোপন করেছেন রাজনৈতিক লবিং ॥ এবারও বিমান বাহিনী প্রধান পদে জঙ্গী বিমান পাইলট নিয়োগ নিয়ে সংশয়

আবু রুশ্‌দঃ এয়ার ভাইস মার্শাল জামাল উদ্দিন আহমদ-এর নিয়োগের মেয়াদ শেষ হয়ে আসার প্রেক্ষিতে পরবর্তী বিমান বাহিনী প্রধান হিসেবে কে নিয়োগ পেতে যাচ্ছেন তা নিয়ে ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্ট মহলে তোলপাড় সৃষ্টি হয়েছে। প্রচলিত রীতি ভেঙ্গে এবারও জঙ্গী বিমানের পাইলট নন এমন একজনকে এয়ার ভাইস মার্শাল পদে বিমান বাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়া হচ্ছে বলে বিমান বাহিনী সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। বর্তমান বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দিন আহমদ যিনি একজন পরিবহন বিমান পাইলট তার মেয়াদ শেষে অপর একজন পরিবহন বিমান বা হেলিকপ্টার পাইলট পরবর্তী বিমান বাহিনী প্রধান নিযুক্ত হতে যাচ্ছেন- এটাই এখন বিমান বাহিনীতে মুখ্য আলোচনার বিষয়। জানা গেছে, সম্ভাব্য প্রার্থীদের মধ্যে একজন এয়ার কমোডর হচ্ছেন বর্তমান বিমান বাহিনী প্রধানের পছন্দনীয় অফিসার যিনি সাধারণত পরিবহন বিমান চালিয়ে থাকেন এবং অপর এয়ার কমোডর যিনি হেলিকপ্টার চালক হিসেবে কমিশন পেয়েছেন তারও সম্ভাবনা উজ্জল হয়ে উঠেছে আ'লীগের একজন প্রভাবশালী নেতার শ্যালক হিসেবে। এসব নানামুখী যোগ-বিয়োগ, হিসাব-নিকাশের মধ্যে আদৌ একজন যোগ্য ও প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ফাইটার পাইলট বিমান বাহিনী প্রধান পদে নিয়োগ পাবেন কিনা তাই সন্দেহের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে

শুধুমাত্র রাজনৈতিক মতাদর্শগত দিকে অতিমাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে যেভাবে এ জাতীয় একটি স্পর্শকাতর পদে নিয়োগ দেয়ার 'ঐতিহ্য' সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে প্রফেশনাল যোগ্যতার পরিবর্তে পলিটিক্যাল কানেকশনই বিবেচিত হচ্ছে প্রধানতম যোগ্যতা হিসেবে। এছাড়া বিগত বছরগুলোয় বর্তমান বিমান বাহিনী প্রধান কর্তৃক মিগ-২৯ সম্পর্কে পত্রিকায় সাক্ষাৎকার প্রদান, দলীয় কর্মীর মতো আচরণ সচেতন মহলে যারপরনাই বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অতি সম্প্রতি তার বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও উঠেছে যে, তিনি বিদেশে বাইপাস সার্জারী করার পরও এ তথ্য গোপন রেখেছেন যাতে শারীরিক অক্ষমতা হেতু তার বিমান বাহিনী প্রধান পদ আগলে রাখায় কোন অসুবিধা না হয়। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায় যে, গত ২০০০ সালের ১৯-২৬ আগস্ট এয়ার চীফ হাওয়াই এর হনলুলুতে অনুষ্ঠিত 'প্যাসিফিক এয়ার চীফস কনফারেন্স'-এ যোগদান করেন। সূত্র মতে, সেখানে যাওয়ার পূর্বেই তিনি দু'সপ্তাহের ছুটি নেন এবং কনফারেন্স শেষে চলে যান নিউইয়র্কে অবস্থানরত মেয়ের কাছে। এরপর নিউইয়র্কের একটি বিশেষ হাসপাতালে তার বাইপাস সার্জারী হয়। পরবর্তীতে তিনি দেশে ফিরে আসলেও তার অপারেশনের কথা দেশবাসীকে জানানো হয়নি। অথচ, এতোবড় একটি অপরেশনের পর এমনিতেই শারীরিক অক্ষমতার জন্য তার বিমান বাহিনী প্রধান পদে থাকার কথা নয়। কিন্তু কোন এক অজ্ঞাত খুঁটির জোরে তিনি এখনও এ পদে বহাল আছেন এবং সক্রিয়ভাবে চেষ্টা করছেন পছন্দনীয় কোন অফিসারকে পরবর্তী বিমান বাহিনী প্রধান বানানোর জন্য যিনি হবেন তার মত একজন পরিবহন বিমন বা হেলিকপ্টার পাইলট। বর্তমান বিমান বাহিনী প্রধানের নিযুক্তির মেয়াদ শেষে নতুন বিমান বাহিনী প্রধান কে হতে যাচ্ছেন সম্প্রতি তা নিয়ে চলছে বিস্তর জল্পনা-কল্পনা, লবিং, তদবির। এ ব্যাপারে বিমান বাহিনী সূত্র জানিয়েছে, এ বছর ৩ জুন এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দিনের অবসর গ্রহণের কথা। সে অনুযায়ী এর প্রায় ১৫ দিন পূর্বে নতুন বিমান বাহিনী প্রধানের নাম ঘোষণা করা হবে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী। স্বাভাবিক নিয়মে সামগ্রিক ক্যারিয়ার ও জ্যেষ্ঠতা বিবেচনায় একজন জঙ্গী বিমান চালক এয়ার কমোডরকে সরকার নিয়োগ দেবেন সেটাই প্রত্যাশিত। কিন্তু সূত্র জানায়, এবারও বিমান বাহিনীর ঐতিহ্য ভেঙ্গে এমন একজনকে বিমান বাহিনী প্রধান নিয়োগ দেয়ার লক্ষ্যে তদবির চলছে যিনি জঙ্গী বিমানের পাইলট নন। জানা গেছে, এক্ষেত্রে বর্তমান বিমান বাহিনী প্রধান তার পছন্দনীয় একজন পরিবহন বিমান চালককে নিয়োগের জন্য জোর সুপারিশ করেছেন। এজন্য তাকে সম্প্রতি সিভিল এভিয়েশন থেকে বিমান বাহিনীতে ফিরিয়ে আনা হয়েছে। নিজে একজন পরিবহন বিমান চালক হিসেবে এয়ার ভাইস মার্শাল জামালউদ্দিন অপর একজন ট্রান্সপোর্টার পাইলট এয়ার কমোডর রফিককে তার স্থলাভিষিক্ত কেন করতে চাইছেন তা এখন আর কারও কাছে অজানা বিষয় নয়। অপরদিকে এয়ার কমোডর রফিক ও বেশ ক'জন জঙ্গী বিমান চালক এয়ার কমোডরের জুনিয়র এয়ার কমোডর দিদারুল আলম যিনি মূলত একজন হেলিকপ্টার পাইলট তাকেও ক্ষমতাসীন রাজনৈতিক মহল বিমান বাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেয়ার লক্ষ্যে উঠে পড়ে লেগেছে বলে সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যে জানা যায়। সূত্র উল্লেখ করে, বর্তমানে মস্কোতে বাংলাদেশ দূতাবাসে ডিফেন্স অ্যাটাশে হিসেবে কর্মরত এয়ার কমোডর দিদার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র ও প্রভাবশালী আ'লীগ নেতা মহিউদ্দিন চৌধুরীর শ্যালক হওয়ায়

তার লবিং বেশ জোরেশোরে চলছে। অথচ পাকিস্তান বিমান বাহিনী একাডেমীতে গ্রাউন্ডেড ক্যাডেট দিদারুল আলম পরবর্তীতে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীতে কমিশন প্রাপ্ত হন ১৯৭৩ সালে এবং একজন হেলিকপ্টার পাইলট হিসেবেই তিনি চাকরিতে নিয়োজিত রয়েছেন। পৃথিবীর কোন বিমান বাহিনীতে একজন পরিবহন বিমান চালক, বাইপাস সার্জারীর রোগী বা হেলিকপ্টার পাইলট বিমান বাহিনী প্রধানের পদ অলংকৃত না করলেও বাংলাদেশে এটাই যেন ঐতিহ্যে পরিণত হতে চলেছে। অথচ বিমান বাহিনী সংশ্লিষ্ট সূত্র মতে, বীরশ্রেষ্ঠ ফ্লাইট লে. মতিউর রহমান, এয়ার ভাইস মার্শাল বাশার, বীরউত্তম, ১৯৬৫-এর যুদ্ধের অন্যতম এস (Ace) পাইলট গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাইফুল আজম, সিতারায়ে জুরাত ও গ্রুপ ক্যাপ্টেন শওকতুল ইসলাম, সিতারায়ে জুরাত-এর মতো বৈমানিক যে বিমান বাহিনীর ঐতিহ্যকে ধারণ করেছেন সেখানে এখনো রয়েছেন অনেক যোগ্য জঙ্গী বিমন চালক। সূত্র মতে, এদের মধ্যে রয়েছেন এয়ার কমোডর ফকরুল আজম, এয়ার কমোডর শফিক, এয়ার কমোডর খসরুল আলম ও এয়ার কমোডর জিয়ারত আলী। জানা যায়, সিনিয়রিটি ও যোগ্যতানুসারে এয়ার কমোডর ফকরুল আজম এয়ার কমোডর রফিক-এর সাথে একই ব্যাচে পাকিস্তান বিমান বাহিনী একাডেমী রিসালপুর থেকে সংযুক্ত পাকিস্তানের শেষ ব্যাচ হিসেবে ১৯৭১ সালে কমিশনপ্রাপ্ত হন। তবে এয়ারফোর্স ক্রমিক অনুযায়ী তিনি এয়ার কমোডর রফিক-এর চেয়ে সিনিয়র। কিন্তু অত্যন্ত যোগ্য জঙ্গী বিমান পাইলট হিসেবে তার সুখ্যাতি থাকলেও তার সবচেয়ে বড় ডিজএডভানটেজ হলো, তিনি বিএনপি'র প্রাক্তন এমপি গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাইফুল আজম, এসজে'র চাচত ভাই। সম্ভবত এই কারণেই তাকে রাখা হয়েছে আউট লাইনে। একই সাথে এয়ার কমোডর শফিক যিনি এয়ার কমোডর রফিক-এর জুনিয়র হলেও এয়ার কমোডর দিদারুল আলম-এর সিনিয়র, তাকেও জঙ্গী বিমান চালক হওয়ার পরও পাঠিয়ে দেয়া হয়েছে বিমান বাহিনীর বাইরে- ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে। তার অপর এক কোর্সমেট জঙ্গী বিমান পাইলট এয়ার কমোডর খসরুল আলমকেও পাঠানো হয়েছে বিমান বাংলাদেশ-এর এমডি হিসেবে। অবশ্য এদের চেয়ে সিনিয়র ও জঙ্গী বিমান চালক হলেও এয়ার কমোডর জিয়ারত আলী শারীরিক অসুস্থতার জন্য এমনিতেই 'প্রতিযোগিতা' থেকে বাদ পড়েছেন। এদের একজনকে আবার অতিসম্প্রতি দেশের বাইরে ডিফেন্স অ্যাটাশে করে পাঠানোর নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যাতে তাকে আগামী ক'বছর বিমান বাহিনীর বাইরে রাখা যায়। মোট কথা, এভাবেই সকল জঙ্গী বিমান পাইলটকে কর্নারড করা হয়েছে ও সে স্থানে বিমান বাহিনী প্রধান বা সরকারী রাজনৈতিক মহলের পছন্দনীয় পাইলটদের প্রস্তুত রাখা হচ্ছে বিমান বাহিনী প্রধান হিসেবে নিয়োগের জন্য। অথচ, বেশ ক'জন উর্ধ্বতন সাবেক বিমান বাহিনী কর্মকর্তা ও নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ক'জন চাকরিরত কর্মকর্তা এবং বিমান সেনার মতে, কখনও একটি প্রফেশনাল বিমান বাহিনীতে যোগ্যতার বাইরে রাজনৈতিক লক্ষ্যে নিয়োগ দেয়া উচিত নয়। তারা আরও বলেন, এভাবে যদি জঙ্গী বিমানের পাইলটদের পরিবর্তে ভিন্ন কাউকে বিমান বাহিনী প্রধান নিয়োগ করা হয়, তাহলে তা যেমন বিমান বাহিনীর সামগ্রিক মানদন্ডে প্রভাব ফেলবে, তেমনি যোগ্য অফিসারদের মধ্যেও নেমে আসবে হতাশা। কারণ, তখন যোগ্যতা প্রমাণের জন্য কেউ আর তৎপর হবেন না, উল্টো ব্যস্ত হয়ে পড়বেন রাজনৈতিক কানেকশন মেনটেইনের জন্য। **(দৈনিক ইনকিলাব,২৬/৩/২০০১)**

বিমান বাহিনীর আকাশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন

আবু রুশদঃ বাংলার আকাশ রাখিব মুক্ত বলে ঘোষণা করলেও বিমানবাহিনীর আকাশ পর্যবেক্ষণ ব্যবস্থা আজ মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন। দেশের চারটি পুরনো রাডার স্থাপনা এখন আর কোনভাবেই বিমান বাহিনীর সার্বক্ষণিক চাহিদা পূরণ করতে পারছে না। দু'বছর পূর্বে নতুন যে দুটো রাডার রাশিয়া থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে সেগুলো স্থাপনেও কোন কার্যকর প্রয়োজনীয় বিল্ডিং ও অন্যান্য স্থাপনা না পাওয়ায় বিমান বাহিনী এখনও ১৮০ কিলোমিটার রেঞ্জের রাডার দুটোকে কাজে লাগাতে পারছে না। এতে একদিকে যেমন বাংলাদেশের আকাশসীমা পর্যবেক্ষনে বিমান বাহিনীর সংশ্লিষ্ট বিভাগকে হিমশিম খেতে হচ্ছে, তেমনি বছরের পর বছর বাক্সবন্দি অবস্থায় পড়ে থাকায় রাডারগুলোর কার্যক্ষমতাও হ্রাস পেতে বসেছে। এদিকে ১৯৯৬ সালে টেন্ডার আহবানের পর থেকে শুরু করে ১৯৯৯ সালে রাডার বাংলাদেশে এসে পৌঁছানোর পর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেগুলো স্থাপনে ব্যর্থ হওয়ায় প্রতিরক্ষা ক্রয় মহাপরিদপ্তর ডিজিডিপি রাশিয়ান কোম্পানীকে জরিমানা করে বলে সূত্র উল্লেখ করে। তবে দরপত্রে উল্লেখিত শর্তানুযায়ী 'ডিলে কষ্ট' (Delay Cost) দিতে রাশিয়ান কোম্পানী কোনমতেই রাজি হয়নি। যেহেতু জরিমানা প্রদানের দায়দয়িত্ব 'রস ভুরুজেনী'র স্থানীয় এজেন্ট 'ট্রেড কানেকশন ইন্টারন্যাশনাল' -এর ঘাড়েই বর্তায়, সেজন্য উচ্চ পর্যায়ে কলকাঠি নেড়ে স্থানীয় এজেন্ট এক সময় 'ডিলে কষ্ট'ও মাফ করিয়ে নিতে সক্ষম হয়। সূত্র জানায়, সাবেক বিমান বাহিনী প্রধানের পরোক্ষ আনুকূল্যে একজন অবসরপ্রাপ্ত এয়ার কমোডর যিনি উল্লেখিত 'ট্রেড কানেকশন ইন্টারন্যাশনাল'-এর অন্যতম অংশীদার তিনি সবকিছু ম্যানেজ করে নিতে সক্ষম হন। এমনকি রাডার-এর কম্যুনিকেশন যন্ত্রাংশ সংগ্রহের জন্য উল্লেখিত স্থানীয় এজেন্ট এখনও এলসি'ই খোলেনি বলে সূত্র জানিয়েছে।

সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় ৪টি পুরানো রাডার দিয়েই কাজ চালাতে হচ্ছে বিমান বাহিনীকে। অথচ, সূত্র মতে, এই রাডারগুলোর কর্মক্ষমতা এখন যেমন অনেক কমে গেছে তেমনি এগুলো প্রায়শই সঠিক রিডিং দিতে ব্যর্থ হচ্ছে। এছাড়া বাংলাদেশ আকাশসীমায় চাহিদানুযায়ী পর্যবেক্ষণ চালানোও পুরানো এই রাডার দিয়ে সম্ভব হয়ে উঠছে না। উল্লেখ্য, ঢাকায় স্থাপিত ইংল্যান্ডের তৈরী লো লুকিং রাডার যেটির রেঞ্জ ৮০ মাইল, সেটি স্থাপন করা হয়েছিল পাকিস্তান আমলে। পাহারকাঞ্চনপুর, যশোর ও চট্টগ্রামে স্থাপিত অপর ৩টি রাডার স্থাপন করা হয় '১৯৮৯-৯০' সালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৈরী এই ৩টি রাডার-এর একটির রেঞ্জ ২৪০ মাইল ও বাকী দু'টির রেঞ্জ ১৬০ মাইল।

এখন এভাবেই বাংলাদেশ বিমান বাহিনী পিছিয়ে পড়ছে তার দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ধরে রাখায়। সংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষকদের মতে, শুধু মিগ-২৯ এর মত অত্যাধুনিক জঙ্গী বিমান দিয়েই আকাশ প্রতিরক্ষায় কার্যকর পদক্ষেপ নেয়া সম্ভব নয়। এজন্য উপযুক্ত রাডার ব্যবস্থাসহ অপরাপর যেসব প্রযুক্তিগত ব্যবস্থাদির প্রয়োজন সেগুলোও সংযুক্ত করতে হবে বিমান বাহিনীতে। কিন্তু এখন যেমন নামকাওয়াস্তেই আনা হয়েছে মিগ-২৯, সংগ্রহ করা হচ্ছে সাবেক আমলের সি-১৩০, তেমনি রাডার স্থাপনেও

দেখানো হচ্ছে চরম দায়িত্বহীনতা। এভাবেই যদি চলে তাহলে 'বাংলার আকাশ' এই বিমান বাহিনী কতটুকু 'মুক্ত' রাখতে সক্ষম হবে সেটাই সকলকে ভেবে দেখতে হবে।
(দৈনিক ইনকিলাব, ১৪/৭/২০০১ ইং)

সামরিক বাহিনীতে হতাশা ঃ কারণ কি?

বর্তমানে বাংলাদেশ সেনা ও বিমান বাহিনীতে সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে চরম হতাশা বিরাজ করছে। ফলে দেশ চৌকস অফিসারদের সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। আর সেনা ও বিমান বাহিনী হারাচ্ছে তাদের দক্ষ কমান্ডারগণকে।

একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র জানিয়েছে যে, কমান্ডে পছন্দের অফিসারদের নিয়োগদানই প্রধানত এই হতাশার মূল কারণ। ব্রিগেডিয়ার শাবাব আশফাক আত্মহত্যা করেন নিজ মাথায় গুলী চালিয়ে। মেয়াদ পূর্তির আগেই ব্রিগেডিয়ার জুবায়ের সিদ্দিকীকে সেনাবাহিনী ত্যাগ করতে হয়েছে। ব্রিগেডিয়ার দানিয়াল ইসলামকে সেনাবাহিনীর বাইরে রাখা হয়েছে দীর্ঘদিন ধরে। সম্ভবত সেখান থেকেই তাকে অবসরে পাঠানো হবে।

সম্প্রতি একজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদত্যাগ করেছেন, কারণ উর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সেনাবাহিনীর প্রচলিত রীতি ও 'চেইন অব কমান্ড' ভঙ্গজনিত হতাশা । তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কালাম শাহেদ। তিনি ছিলেন গুইমারায় অবস্থিত ২৪ আর্টিলারী ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার। তিনি পাকিস্তান মিলিটারী একাডেমীর ৪৭তম লং কোর্সের অফিসার। দেখা যাচ্ছে, রক্ষীবাহিনীতে কমিশনপ্রাপ্ত অফিসার যাদের সেনাবাহিনীতে আত্মীকরণ করা হয়েছে, তারাই গুরুত্বপূর্ণ কামন্ডগুলো পাচ্ছেন। পদোন্নতির দিক থেকেও তারাই বর্তমানে এগিয়ে। রক্ষীবাহিনীর অফিসার হিসেবে আর্মিতে অন্তর্ভূক্ত হওয়া মে.জে. রফিককে ইতোমধ্যেই ময়মনসিংহে অবস্থিত ১৯ পদাতিক ডিভিশনের জিওসি করা হয়েছে। এদিকে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল কালাম শাহেদের পদত্যাগপত্র প্রেসিডেন্টের অনুমোদন লাভের পর গত ১১ জানুয়ারী তিনি ব্রিগেডিয়ার জেনারেল জাহাঙ্গীর আলমের কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিয়েছেন। একটি সূত্র জানায় যে, শৃঙ্খলাবিরোধী অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশ নিতে জোরজবরদস্তি করা হলে তিনি পদত্যাগপত্র পেশ করাকেই শ্রেয় বলে বেছে নেন। সূত্র আরও জানায়, প্রায় মাস দুয়েক পূর্বে কোন একটি বিলে তাকে স্বাক্ষর করতে বলা হয়, কিন্তু তিনি তাতে স্বাক্ষর করতে রাজি হননি। কারণ সেই বিল ও অন্যান্য কাগজপত্র সঠিক ছিল না। পরবর্তীতে ছুটিতে থাকাকালীন সাময়িকভাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্রিগেড কমান্ডারের কাছ থেকে উল্লিখিত বিলে স্বাক্ষর নেয়া হয় বলে তিনি জানতে পারেন। এ প্রেক্ষিতে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহেদ যেমন অত্যন্ত অপমানিতবোধ করেন, তেমনি সেনাবাহিনীর প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করা হয়েছে বলে মনে করেন।

এক পর্যায়ে তদানীন্তন সেনাপ্রধান লে. জে. মুস্তাফিজুর রহমান ঘটনা তদন্ত

শেষে ব্যবস্থা নেয়া হবে বলে জানালেও অজ্ঞাত কারণে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল শাহেদ-এর পদত্যাগপত্র গৃহীত হয়ে যায়।

একজন চৌকস আর্মি অফিসার হিসেবে তার প্রচুর সুনাম ছিল, অথচ সরকারের এসব বিষয়ে তেমন কোন মাথাব্যথা নেই। পদত্যাগ করতে চাচ্ছে, ঠিক আছে আর্মি ছেড়ে চলে যান, কোন ভাল অফিসার চলে যাচ্ছেন, আর কে থাকছেন-এসব আদৌ কোন ব্যাপার নয় বর্তমান সরকারের কাছে। ব্রিগেডিয়ার শাবাব ছিলেন ২৪ পদাতিক ডিভিশনের অধীন ৬৯তম ব্রিগেডের ব্রিগেড কমান্ডার। তিনি যখন ক্যাপ্টেন তখন তিনি প্রেসিডেন্ট এরশাদের এডিসি ছিলেন, যখন মেজর হিসেবে পদোন্নতি পান, তখন তিনি এরশাদ সাহেবের এপিএস হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। সেটাই যেন তার জীবনের কাল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। পরে বেগম জিয়ার শাসনকালেই শাবাব লে. কর্নেল থেকে কর্নেল হিসেবে পদোন্নতি পেয়েছিলেন। জেনারেল মুস্তাফিজ যখন সেনাপ্রধান এবং ১৯৯৯ সালের শেষ দিকে ব্রিগেডিয়ার শাবাবকে মেজর জেনারেল হিসেবে পদোন্নতি দিয়ে বগুড়ায় ১১তম ডিভিশনের জিওসি হিসেবে বদলি করার কথা ছিল। হঠাৎ শাবাবকে পদোন্নতি না দিয়ে পাকিস্তানে বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে ডিএ (ডিফেন্স এ্যাটাশে) করে বদলির খবর দেয়া হল। এর অর্থ হচ্ছে- সেনাবাহিনী থেকে তাকে দূরে রেখে তিন বছর তার আর কোন পদোন্নতি দেয়া হবে না এবং এখান থেকেই তাকে অবসরে পাঠিয়ে দেয়া হবে। এ চক্রান্ত ব্রিগেডিয়ার শাবাব মেনে নিতে পারেননি। এর পরের ঘটনা সবারই জানা। এছাড়া হতাশাজনিত কারণে সেনাবাহিনী থেকে মে. জে. সহুল আফজাল, ব্রিগেডিয়ার ফারুক আশফাক ও মাহবুব পদত্যাগ করেন।

বর্তমান সেনাপ্রধান দায়িত্ব গ্রহণের পরপরই সেনাবাহিনীতে ব্যাপক রদবদলের খবর পাওয়া গেছে। মরহুম সৈয়দ নজরুল ইসলামের পুত্র বিগ্রেডিয়ার সৈয়দ শাফায়াতকে নবম ডিভিশনের দায়িত্ব দেয়া হতে পারে বলে জানা গেছে।

গত বছর দুর্ভাগ্যজনকভাবে চাকরি হারালেন গোলন্দাজ কোর-এর একজন চৌকস জেনারেল ইমামুজ্জামান। তিনি ছিলেন একজন খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা অফিসার। বর্তমান সেনাপ্রধান লে. জে. হারুন-অর-রশীদ, মে. জে. ইমামুজ্জামান এর সাথেই PMA থেকে কমিশনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন ১৯৭০ সালে।

সেনাবাহিনীর অফিসারগণের পদোন্নতি সংক্রান্ত এক সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রধানমন্ত্রী। সেই সভায় তিনি বলেছিলেন, কেবলমাত্র দেশপ্রেমিক অফিসারবৃন্দ পদোন্নতি পাবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ কমান্ডে সেইসব দেশপ্রেমিক অফিসারগণই আসবেন। প্রধানমন্ত্রীর এই উক্তি সেনাবাহিনীর জন্য তো অবশ্যই, পুরো দেশবাসীর জন্যই হতাশাজনক। ৭টি পদাতিক ডিভিশন এবং কিছু ব্রিগেডকে যারা কমান্ড করছেন, তারাই কেবল দেশপ্রেমিক? অন্যসব সেনা অফিসারগণ কি দেশপ্রেমিক নন? প্রেষণের মাধ্যমে কয়েকজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ও মেজর জেনারেলকে বর্তমানে আর্মি থেকে বাইরে রাখা হয়েছে, অথচ সেই সব অফিসারগণের সেনাবাহিনীতে প্রচুর সুনাম রয়েছে। পূর্বে

যেসব স্থানে সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত অফিসারদের নিয়োগ দেয়া হত, বর্তমানে সেনাবাহিনীতে চাকরীরত অফিসারদের সেখানে প্রেষণে পাঠানো হচ্ছে। স্বভাবিকভাবেই সেসব অফিসার হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়বেন- সেটাই স্বাভাবিক।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সেনা সদর দফতরে এমজিও হিসেবে কর্মরত মেজর জেনারেল মাহমুদকে গাজীপুরে অর্ডিন্যান্স ফ্যাক্টরীতে বদলি করা হয়েছে। মরহুম শেখ জামালের কোর্সমেট এসএস-২-এর অফিসার ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইসহাক ইব্রাহিমকে করা হয়েছে বগুড়া ডিভিশনের অ্যাকটিং জিওসি। এই পরিবর্তনগুলো থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, যারাই অ্যাকটিং হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন, তারা কিছুদিনের মধ্যেই মেজর জেনারেল পদে পদোন্নতি পাচ্ছেন। অথচ তাদের সিনিয়র অফিসারগণকে পূর্বপরিকল্পনা করেই সেনাবাহিনীর বাইরে রাখা হয়েছে। এখন আওয়ামী লীগের আদর্শে বিশ্বাসী অফিসারগণই সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদগুলোতে আসীন আছেন, যা কিনা সেনাবাহিনীতে চরম হতাশার কারণ। এদিকে বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর অবস্থাও বেশ করুন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত বিমানবাহিনীর যে শক্তি ছিল, বর্তমানে তা অর্ধেকে এসে দাঁড়িয়েছে। এর প্রধান ও অন্যতম কারণ- সঠিক পরিকল্পনা ও তা বাস্ত বায়নের অদক্ষতা। প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শেখ হাসিনার বিমানবাহিনী সম্পর্কে অদক্ষতা, ব্যক্তিগত ইগো বাস্তবায়নের কারণেই বিমানবাহিনীর এই নাজুক অবস্থা। ১৯৯১ সালের ঘূর্ণিঝড়ে চট্টগ্রাম বিমান ঘাঁটিতে রক্ষিত বিমানবাহি-নীর ৩২টির বেশী চীনা এফ-৬ জঙ্গী বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। তখন দ্রুত সেসব রিপ্লেসমেন্ট-এর সাহায্যের হাত এগিয়ে দেয় পাকিস্তান। পাকিস্তান বিমানবাহিনী অতি দ্রুততার সাথে প্রায় ৪০টি এফ-৬ ও এফটি-৬ বিমান পাঠিয়ে দেয় বাংলাদেশ বিমানবাহিনীর জন্য। এই প্রশংসা তখনকার বিএনপি সরকারেরও প্রাপ্য। দুঃখের বিষয়, আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে ১৯৯৬ সালে চট্টগ্রাম বিমান ঘাঁটিতে অবস্থিত ২ স্কোয়াড্রন এফ-৬ জঙ্গী বিমানকে গ্রাউন্ডেড করে দেয়। এ বিষয়টি সম্পর্কে বিমানবাহি-নীর স্টাফ প্রধান বললেন যে, বিমানগুলো উড্ডয়ন ক্ষমতা হারানোর জন্যই বিমানবাহি-নীর বহর থেকে এফ- ৬ কে বাদ দিতে হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, আমরা সরকার গঠনের পরপরই দেখেছি যে, পুরনো সেকেলে ধরনের জঙ্গী বিমান। উড্ডয়ন করতে গিয়ে দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে আমাদের বেশ কয়েকজন তরুণ বৈমানিক নিহত হয়েছেন। তাই পুরনো জঙ্গী বিমান বিমানবাহিনীর তালিকা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে। একটি সূত্র জানায় যে, বিমানগুলো পাকিস্তান সরবরাহ করেছিল বলেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সেই এফ-৬ বিমানগুলোকে বিমানবাহিনীর তালিকা থেকে বাদ দেয়ার আদেশ দিয়েছিলেন। অথচ প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশ মেনে নিয়ে স্টাফ প্রধান বিমানবাহিনী থেকে ৩২টি এফ-৬ বিমানের রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে কি ধরনের জঙ্গী বিমান বিমানবাহিনীতে নিয়ে এসেছেন? বিএনপি সরকারের প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়ার করুণায় এভিএম জামালউদ্দিন আহমেদ বিমানবাহিনীর স্টাফ প্রধান হতে পেরেছিলেন। একজন পরিবহন পাইলট কখনই টোটাল কমান্ড অ্যাচিভ করতে পারেন না। এদিকে পূর্বে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনস-এর এমডি হিসেবে দায়িত্ব পালন করে গেছেন গ্রুপ ক্যাপ্টেন শওকাতুল ইসলাম (অব.)। বিমানের এমডি হিসেবে শওকত সাহেবই ছিলেন প্রধান

টেকনোক্র্যাট। পরে বিমানবাহিনী থেকে প্রেষণে এমডি হিসেবে আসছেন বিমানবাহিনীর এয়ার কমডোর র‍্যাঙ্ক এর অফিসারগণ। পূর্বে সিভিল এভিয়েশন অথরিটির চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বিমানবাহিনীর অফিসার গ্রুপ ক্যাপ্টেন সাইফুল আজম (অব.)। এখন বিমানবাহিনী থেকে এয়ার কমডোর র‍্যাঙ্ক এর অফিসারকে প্রেষণে এই দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হয়ে থাকে। এর অর্থ হচ্ছে, স্টাফ প্রধানের যদি কোন এয়ার কমডোরকে পছন্দ না হয় তবে সেই এয়ার কমডোরকে বিমানবাহিনী থেকে বাইরে রাখতে প্রেষণে বিমান/সিভিল এভিয়েশনে পাঠিয়ে দেয়া হয়। সম্প্রতি এয়ার কমডোর এম রফিকল ইসলামকে বিমানবাহিনীতে ফেরত নিয়ে সেখানে এয়ার কমডোর এম খসরুল আলমকে বিমানের এমডি হিসেবে প্রেষণে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এয়ার কমডোর রফিক স্টাফ প্রধান জামালউদ্দিনের স্নেহভাজন একজন পরিবহন বৈমানিক। এয়ার কমডোর এম খসরুল আলম একজন দক্ষ ও চৌকস ফাইটার পাইলট। যে অফিসারের বিমানবাহিনীতে কোন কমান্ড অথবা প্রশাসনিক পর্যায়ে থাকার কথা, সেই অফিসার এখন বিমানের এমডি। এমনও অভিযোগ রয়েছে যে, FLYING INSTUCTORS COURSE করার জন্য কয়েকজন স্টুডেন্ট অফিসার গেছেন F.I.S-য়ে। কোর্স শুরু হওয়ার সাথে সাথেই দু'জন স্টুডেন্ট অফিসারকে পাওয়া গেল এমন যে, তারা ছিল বিলো দি মার্ক। সেই দু'জন অফিসারকে সাথে সাথেই তাদের স্কোয়াড্রনে ফেরত পাঠানো হল এবং F.I.S থেকে দু'জন যোগ্য স্টুডেন্ট অফিসার চাওয়া হল। পরে জানা গেল যে, দু'জন F.I. COURSE থেকে বাদ পড়েছিল তারা দু'জনই পরিবহন স্কোয়াড্রনের অফিসার। পরে একজন সিনিয়র অফিসারের হস্তক্ষেপে F.I. কোর্স থেকে বাদ পড়া অফিসার দু'জনই কোর্সে অংশ নিতে আসে।

যে অফিসার গনের উড্ডয়ন প্রশিক্ষক হওয়ার যোগ্যতা থাকে না, তাদেরই যদি উড্ডয়ন প্রশিক্ষক করা হয়, তাহলে উড্ডয়নের মান কেমন হবে- তা আর বলার প্রয়োজন রাখে না।

এদিকে স্টাফ প্রধান তার সার্ভিসের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য মিগ-২৯ ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই কোমর বেঁধে নেমে পড়লেন। পত্র-পত্রিকায় এমন সব সাক্ষাৎকার তিনি প্রদান করলেন যে, সরকার প্রধানকে খুশী করে ফেললেন, স্টাফ প্রধানের চাকরির মেয়াদও বৃদ্ধি পেল। মিগ-২৯ ক্রয় নিয়ে দেশের মানুষ যখন এর চরম বিরোধিতা করছিল, তখন ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষার জন্য যা ইচ্ছা তাই বলে গেলেন পত্রিকার মাধ্যমে। বিমানবাহিনীর স্বার্থ তার কাছে কোন সময়ই তেমন গুরুত্ব পায়নি।
(মোহাম্মদ মাসুদ দৈনিক ইনকিলাব, ২০/৩/০১)

জে. মুস্তাফিজ এলপিআর-এ থেকেও আ'লীগের পক্ষে প্রকাশ্যে রাজনীতি করছেন, কিন্তু কিভাবে?

ইনকিলাব রিপোর্টঃ জীবনে দ্বিতীয়বারের মতো প্রাক অবসরকালীন ছুটিতে থেকে,

সেনাবাহিনীর বাসায় বসবাস করে সাবেক সেনাপ্রধান জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান অযাচিতভাবে একটির পর একটি রাজনৈতিক মন্তব্য করে চলেছেন। এমনকি প্রকাশ্যে কথিত 'সুধী সমাবেশে' যোগদানের নামে তিনি রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণসহ আসন্ন সংসদ নির্বাচনে তাকে ভোট দিয়ে জয়ী করার আহবানও জানাচ্ছেন জনগণের প্রতি। সুস্পষ্টভাবে সরকারী চাকরিবিধি লংঘন করে জে. মুস্তাফিজ শুধু যে নির্বাচনী প্রচারাভিযান চালাচ্ছেন তা নয়, বরং তার অনেক, অ-নে-ক সিনিয়র দু'জন সাবেক সেনাপ্রধান যারা পরবর্তি দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন তাদের বিরুদ্ধে বিষোদগার করছেন অত্যন্ত শ্রুতিকটুভাবে। তবে তিনি তার এসব তৎপরতা সম্পর্কে উৎসাহিত বোধ করলেও সচেতন সকলেই তার আচরণকে নিতান্ত অনভিপ্রেত বলে চিহ্নিত করেছেন। সেনাবাহিনী থেকে শুরু করে বেসামরিক অঙ্গন-বিশেষ করে রাজনৈতিক মহলে তার এসব বালখিল্য উক্তি সম্পর্কে ইতোমধ্যেই শুরু হয়েছে ব্যাপক গুঞ্জন।

এতে যেমন অনেকে বিরক্তি বোধ করছেন, তেমনি অনেকে ভ্রু কুঁচকে জানতে চাচ্ছেন- এলপিআর-এ থাকাবস্থায় কিভাবে জে. মুস্তাফিজ প্রকাশ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারাভিযানে অংশগ্রহণ করছেন? এ ব্যাপারে সেনাবাহিনীর অনেক অফিসার ও সৈনিক ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার পাশাপাশি সাধারণ জনগণও প্রশ্ন করছেন- শুধু কি প্রধানমন্ত্রীর ফুফা হওয়ার বদৌলতেই জে. মুস্তাফিজের জন্য সাত খুন মাফ? যদি তাই না হবে, তাহলে তিনি এখনও ঢাকা সেনানিবাসে ৩ নম্বর শহীদ স্বরণিতে বসবাস করে জনসভায় আ'লীগকে ভোট দানের আহবান জানাচ্ছেন কোন খুঁটির জোরে? এছাড়া, এলপিআর-এ থাকাকালীন কোন সেনাকর্মকর্তা রাজনীতিতে অংশ নিতে পারেন কিনা সে প্রসঙ্গও উঠে এসেছে সমালোচনার অংশ হিসেবে। এক্ষেত্রে গত ১১ মার্চ ২০০১ তারিখ রাতে রংপুর সদর উপজেলার তপোধন ইউনিয়নে আয়োজিত এক জনসভায় জে. মুস্তাফিজ প্রদত্ত বক্তব্যের উল্লেখ করে পর্যবেক্ষক মহল সেনাপ্রশাসন ও সরকারের কাছে জানতে চেয়েছেন যিনি এখনও সরকারী বেতন গ্রহণ করছেন, যার এখনও সেনা আইনের আওতায় থাকার কথা তিনি আ'লীগসহ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগামীতে ক্ষমতায় আসছেন .বলে আগাম ঘোষণা দিয়ে বেড়াচ্ছেন কেন? এছাড়া জাপা চেয়ারম্যান লে. জে. এরশাদ জেল খাটবেন কি খাটবেন না, নিজামী 'রাজাকার' না অন্যকিছু তা নির্ধারণ করে দেয়ার দায়িত্ব তার ওপর অর্পন করেছেন কে? অথচ, সেনা আইন অনুযায়ী এলপিআর-এ থাকাকালীন রাজনীতি করার বিধান না থাকলেও তিনি দিব্যি এসব করে বেড়াচ্ছেন সবার অবাক চোখের সমানে। এক্ষেত্রে গত ১১ মার্চ ২০০১ তারিখে জে. মুস্তাফিজ রংপুরে এক জনসভায় বলেছেন, 'আমি ভবিষ্যৎবাণী করিয়া গেলাম আগামীতে শেখ হাসিনা আবারও প্রধানমন্ত্রী হইবেন। তবে নিজামী ও রাজাকারের স্থান বাংলাদেশে নাই।' এছাড়া ঐ একই দিন রংপুর সদর উপজেলার মমিনপুর ইউনিয়নে আয়োজিত এক 'সুধী সমাবেশেও' তিনি অত্যন্ত আপত্তিকর ভাষায় জে. এরশাদ ও জে. জিয়াউর রহমানকে লক্ষ্য করে কটুক্তি করেন।

তিনি বলেন, 'এরশাদ ছিলেন দুই তারকার জেনারেল। ক্ষমতা দখল করিয়া তিন. তারকার জেনারেল হন। জিয়াউর রহমানও দুই তারকার জেনারেল ছিলেন। আমি হইলাম চার তারকার জেনারেল।'

এদিকে জে. মুস্তাফিজের এই মন্তব্য সম্পর্কে দু'জন অবসরপ্রাপ্ত জেনারেলের কাছে জানতে চাওয়া হলে তারা এজাতীয় বক্তব্যকে সেনাবাহিনীর কোন মর্যাদাসম্পন্ন সিনিয়র কর্মকর্তার উক্তি হিসেবে চিহ্নিত না করে একে একজন হাবিলদারের স্ট্যাটাসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ মন্তব্য বলে উল্লেখ করেন। তারা বলেন, পৃথিবীতে এমন একজন সেনাপ্রধান কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে- যেখানে এলপিআর থেকে ফিরে এসে কোন অফিসার সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পদে আসীন হন? শুধু তাই নয়, নিতান্তই প্রধানমন্ত্রীর আত্মীয় হবার সুবাদে তাকে আবার চার তারকার জেনারেলও বানানো হয়। তাদের মতে,জেনারেল প্যাটন, জেনারেল ওসমানীও জেনারেল ছিলেন আর যিনি নিজেই নিজের ঢাক পিটান সেই মুস্তাফিজ সাহেবও জেনারেল। এ দুজন কর্মকর্তা আরও জানান জেনারেল মুস্তাফিজের বক্তব্য মতে,জে. এরশাদ ক্ষমতা নেয়ার পরে তিন তারকা অর্থাৎ লে. জে. পদে উন্নীত হয়েছিলেন বলে যে দাবী করা হয়েছে তা যেমন আদৌ সত্য নয় তেমনি জিয়াউর রহমান দুই তারকার জেনারেল অর্থাৎ মেজর জেনারেল একথাও চরম মিথ্যাচার বৈ কিছু নয়। কারণ মে. জে. জিয়াউর রহমান ১৯৭৫ সালের ২৪ আগষ্ট সেনাপ্রধান হিসাবে নিয়োগ পাবার পর লে. জেনারেল পদে উন্নীত হন ১৯৭৮ সালে । তেমনি লে. জে. জিয়া চাকরী থেকে অবসর নেয়ার পর ১৯৭৯ সালেই মে. জে. এরশাদকে লে. জেনারেল পদে পদোন্নতি দিয়ে সেনাপ্রধান নিয়োগ করা হয়। সবচেয়ে বড় কথা,মুক্তিযুদ্ধের জেড ফোর্সের কমান্ডার জিয়াউর রহমান বীর উত্তমের সাথে জে. মুস্তাফিজ নিজেকে কিভাবে তুলনা করতে পারেন সেটাই সবার কাছে মুখরোচক আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কারণ মে. জে. শফিউল্লাহ, লে. জে. জিয়াউর রহমান ও ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ তাদের রাজনৈতিক পরিচয়ের বাইরেও মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে নিঃসন্দেহে জে. মুস্তাফিজের চেয়ে অনেক,অ-নে-ক বড় মাপের ব্যক্তিত্ব। তারপরও সমালোচনা অবশ্যই মেনে নেয়া যায়, রাজনীতি চর্চাকেও দোষের বলে চিহ্নিত করা যায় না যদি না জে. মুস্তাফিজ এলপিআর সারেন্ডার করে বেসামরিক সাধারণ জনতার কাতারে চলে আসার সৎ সাহস দেখাতে পারতেন।অবশ্য দ্বিতীয়বারের মত এলপিআর নিয়ে সরকারী অর্থের যিনি শ্রাদ্ধ করছেন তিনি যে নিজেরই দাবী মত কতোটুকু বীরপুরুষ তা বলার অপেক্ষা রাখে না ।এটাও বলতে হয় জে. মুস্তাফিজ এরশাদ, জিয়াকে ব্যঙ্গ করে নিজেকে চার তারকার জেনারেল হিসাবে প্রচার না করলেই হয়তো শোভন হাত। কারণ নিজে যারে বড় বলে বড় সে নয়, লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়।তবে জে. মুস্তাফিজ ছাত্রাবস্থায় এই ভাব সম্প্রসারণ চর্চা করেছেন কিনা সেটাই সন্দেহের বিষয়। **(দৈনিক ইনকিলাব-১৫/০৩/০১)**

আওয়ামী লীগ শাসনামলে ডিজিএফআই-১

চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে কর্নেল ইকবাল মেতে উঠেন যথেচ্ছারে।। এস এ খালেককে উঠিয়ে আনা হয় ডিজি'র অগোচরে

আবু রুশ্‌দঃ বিগত সরকারের আমলে ডিজিএফআই অর্থাৎ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদফতরে কর্মরত কতিপয় কর্মকর্তার তৎপরতা নিয়ে চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া গেছে। সামরিক ও বেসামরিক এসব গোয়েন্দা কর্মকর্তা সে সময় প্রতিরক্ষা বাহিনী ও রাষ্ট্রের সার্বিক স্বার্থরক্ষার চেয়ে নিতান্ত ব্যক্তি এবং দলীয় স্বার্থরক্ষায় অতিউৎসাহী ভুমিকা পালনে মেতে উঠেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাদের এই ভুমিকা সরকারী কর্মচারী হিসাবে কর্মপরিধির গন্ডি অতিক্রম করে দলীয় ক্যাডারের ভূমিকায় পরিণত হয়েছিল। সবচেয়ে অবাক করা ব্যাপার হলো ডিজিএফআই-এর প্রাতিষ্ঠানিক চেইন অব কমান্ড ভঙ্গ করে উল্লেখিত কর্মকর্তাগণ তদানীন্তন সরকারের ইনার সার্কেলের নির্দেশে এমন হঠকারী তৎপরতা শুরু করেন যা প্রায়শই সংশ্লিষ্ট সংস্থার শীর্ষ ব্যক্তি থেকে শুরু করে সকলকে বিব্রতকর পরিস্থিতির সম্মুখীন করে তুলতো।

সদ্য বাধ্যতামূলক অবসরপ্রাপ্ত ব্রিগেডিয়ার জেনারেল ইকবাল হোসেন ছিলেন এই চক্রের মূল ব্যক্তিত্ব । সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, তিনি কর্নেল পদে থাকাকালীন ডিজিএফআই-এর পরিচালক সিআইবি হিসেবে যোগ দেয়ার পর থেকেই তোঘলকি কায়দায় ক্যাডারসুলভ তৎপরতা শুরু করেন। একই সাথে মধ্যম সারির বেশ ক'জন সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তা সমন্বয়ে গড়ে তোলেন একটি 'মাফিয়া সিন্ডিকেট'। আ'লীগ আমলের শেষ দিন পর্যন্ত এই সিন্ডিকেটের হম্বিতম্বিতে অস্থির ছিলেন সবাই।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়,মধ্যম সারির কর্মকর্তাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও অঘটনঘটনপটিয়সী ছিলেন জনৈক মেজর, যিনি আত্মীয়তা সূত্রে ছিলেন শেখ পরিবারের একজন এমপি'র ভায়রা। জানা যায়,এই মেজর এমন আচরন করতেন যাতে সবাই তার ভয়ে তটস্থ থাকতেন। এমনকি সিনিয়র কর্মকর্তাদেরও তিনি প্রায়ই অপমান -অপদস্থ করতেন।আদেশের সুরে কথা বলতেন । শেখ পরিবারের এমপি'র নির্দেশনা মতেই উল্লেখিত কর্মকর্তা কি করতে হবে,আর কি করা যাবে না তা জানিয়ে দিতেন অপরাপর কর্মকর্তাদের। এছাড়া বিশেষ বিশেষ অপারেশনও পরিচালিত হত তার দেয়া গাইডলাইন অনুযায়ী। এক্ষেত্রে কর্ণেল ইকবাল কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পরিচালক হওয়ায় সমন্বয় সাধন করার বিষয়টি ছিল সহজ। বলা চলে, একরকম মিশনারী উদ্দেশ্য নিয়েই এই দুজন ডিজিএফআইকে জড়িয়ে ফেলেন আ'লীগের যাবতীয় উপায়ে স্বার্থরক্ষা ও বিরোধী দলকে হেয় প্রতিপন্ন করার কাজে। সেসময় তাদের ভাব ভঙ্গি দেখে মনে হত একমাত্র আওয়ামীকরণেই দেশের মঙ্গল এবং ডিজিএফআই-এর একমাত্র কাজ হচ্ছে আ'লীগের পারপাস সার্ভ করা তা সে যে পথেই হোক না কেন। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে,কর্ণেল ইকবাল ও তার অনুগামীরা

যখন একটির পর একটি অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন কিন্তু বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই মহাপরিচালক ও অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তারা তার কিছুই জানতে পারেনি। এ পর্যায়ে দল থেকে নির্দেশ পেয়ে গোপনীয়ভাবে তারা সবকিছু এ্যারেঞ্জ করতেন এবং কাজ শেষ করার মুহূর্তে জানাতেন ডিজি' কে । আবার অনেকক্ষেত্রে তা জানাতেনও না।

১৯৯৮ সালের জানুয়ারী মাসে মিরপুরের বিএনপি নেতা এসএ খালেককে (বর্তমানে বিএনপি এমপি) উঠিয়ে আনার ক্ষেত্রেও এমন ঘটনা ঘটেছিল বলে সূত্র জানিয়েছে।প্রাপ্ত তথ্যমতে সেসময় কর্ণেল ইকবাল ও তার জি-২ (কর্ড) জনৈক মেজর ছিলেন 'অপারেশন খালেক'-এর মূল পরিকল্পক ও বাস্তবায়নকারী। আরো জানা যায়, উল্লিখিত জি-২ (কর্ড) হিসেবে নিয়োজিত মেজরের ক্যাডারবৃত্তিও ছিল দৃষ্টিকটু পর্যায়ের। অথচ অকুণ্ঠ দলীয় প্রীতির কারণেই সেনা শিক্ষা কোরের অফিসার হওয়ার পরও উক্ত মেজরকে সিআইবি'র মতো গুরুত্বপূর্ণ ব্যুরোর জি-২ (কর্ড)-এর পদে বসানো হয়। পরবর্তীতে তার কাজের পুরস্কারস্বরূপ তাকে বিদেশে পোস্টিং-এর ব্যবস্থা করে দেন কর্নেল ইকবাল। এসএ খালেককে জোর করে উঠিয়ে আনার ঘটনা সম্পর্কে সূত্র জানায় যে, ডিজি'র অগোচরে দলের হাইকমান্ডের নির্দেশনা মতে কর্নেল ইকবাল তার জি-২ (কর্ড)-কে দায়িত্ব দেন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য। আদিষ্ট হয়ে উক্ত মেজর অতি উৎসাহে পরিকল্পনা পাকাপোক্ত করেন। এরই এক পর্যায়ে মিরপুরের ইসমাইল কমিশনারসহ এসএ খালেককে তার বাড়ী থেকে উঠিয়ে আনা হয়।

এই অপরেশনে নিজে হাজির থেকে নেতৃত্ব দেন কর্নেল ইকবাল স্বয়ং। জি-২ (কর্ড) ও সশরীরে উৎসাহের সাথে যোগ দেন অপারেশনে। পরবর্তীতে যখন মিডিয়ার জন্য 'খালেক লিফটিং' পন্ড হতে বসে তখন কর্নেল ইকবাল অর্থ ও ডিজিএফআই-এর সাংগঠনিক কাঠামোকে কাজে লাগিয়ে পূর্বোক্ত কমিশনারের মাধ্যমে 'প্রেস কনফারেন্সের' ব্যবস্থা করেন। জানা যায়, এই ঘটনায় ডিজি-ডিজিএফআই তদানীন্তন ব্রিগেডিয়ার নজরুল ইসলাম দারুন অপ্রস্তুত অবস্থায় পড়ে যান।

এভাবে ডিজিএফআইকে দলীয় সম্পত্তির মত ব্যবহার করেছেন কর্নেল ইকবাল গং। তাদের লক্ষ্য ছিল একটিই-চিরদিনের মত বাংলাদেশের মসনদে আ'লীগকে টিকিয়ে রাখা। তবে এসব স্বার্থবাজ-চাটুকারদের জন্য ঐতিহ্যবাহী দল হিসেবে আ'লীগের লাভ হয়নি; বরং ক্ষতিই হয়েছে। অবশ্য ভবিষ্যতের জন্য তারা রেখে গেছেন দিকনির্দেশনা, যাতে অন্য কেউ এমন আচরণ না করে।**(দৈনিক ইনকিলাব ঃ ২৭/০১/২০০২)**

<u>আওয়ামী লীগ শাসনামলে ডিজিএফআই-২</u>

কাদের সিদ্দিকী '৯৯-এর উপনির্বাচনে পরাজিত হননি ॥ বেগম জিয়া ও আব্দুর রহমান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে চালানো হয় অশালীন প্রচারণা

আবু রুশ্‌দঃ আওয়ামী লীগ শাসনামলে ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত টাঙ্গাইলের বাসাইল-সখিপুর উপনির্বাচনে বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী, বীর উত্তম পরাজিত হননি, তাকে

পরাজিত করা হয়েছিল। এজন্য তদানীন্তন সরকারের শীর্ষ মহল থেকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়েছিল গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে। ১৯৯১ সালের পর গণতন্ত্রিক রাজনীতির ইতিহাসে কখনোই এমন নির্লজ্জভাবে গোয়েন্দা সংস্থাকে মাঠে নামানো হয়নি সরকারের প্রতিপক্ষকে নির্বাচনে পরাজিত করার জন্য। এক্ষেত্রে ডিজিএফআইকে প্রচলিত নীতিমালা অনুযায়ী জড়িত করার কথা না থাকলেও সকল কিছু নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার নির্দেশ দেয়া হয় দলের হাই কমান্ড থেকে। এরপর ক্যাডারবৃত্তি করা কাকে বলে সেটা চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন কর্নেল ইকবাল এন্ড গং। অবশ্য সবচেয়ে উৎসাহী ভূমিকা পালন করেছিলেন শেখ পরিবারের এমপি'র ভায়রা-সেই মেজর সাহেব। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, সেই মেজর সাহেব রীতিমতো বক্তৃতা দিয়ে গাড়ী, ওয়্যারলেস বহর নিয়ে বাসাইল-সখিপুর এলাকায় গিয়ে ঘাঁটি গেড়ে বসেন। তার নির্দেশনামতো চলতে থাকে 'গায়েবী কায়কারবার'। আর কন্ট্রোলে বসে থাকেন কর্নেল ইকবাল স্বয়ং। অবশ্য শুধু মিলিটারীম্যানরাই এই অপারেশনে অংশ নেয়নি; বরং ডিজিএফআইতে কর্মরত ক'জন সিভিল কর্মকর্তা যারা প্রথম থেকেই ছিলেন 'মাফিয়া চক্রে'র অন্তর্ভুক্ত তারাও সোৎসাহে অংশগ্রহণ করেন মিশন সফল করার লক্ষ্যে। ক্যাডারের ভূমিকা পালনকারী এরূপ কর্মকর্তাদের মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য ছিলেন সিআইবি অর্থাৎ কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর পলিটিক্যাল উইং-এর একজন উপপরিচালক ও ঢাকা শাখার একজন সহকারী পরিচালক। এই সহকারী পরিচালককে আবার এক সময় কর্ড অফিসার পদেও বসিয়েছিলেন কর্নেল ইকবাল।

অবশ্য কাদের সিদ্দিকীকে কৌশলে হারিয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে গোয়েন্দা কার্যক্রম পরিচালনার পূর্বে বরিশাল সদর আসনের উপনির্বাচনেও এমন ঘটনা ঘটেছিল বলে সূত্র জানিয়েছে।

সূত্র মতে, সেখানে বিএনপি প্রার্থী এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমান সারোয়ারকে পরাজিত করার জন্য ডিজিএফআইকে মাঠে নামানো হয়েছিল। কিন্তু সেবার যে কোন কারণেই হোক সরোয়ারকে পরাজিত করা যায়নি। তবে তখন যে অভিজ্ঞতা অর্জিত হয়েছিল- পরবর্তীতে তাই কাজে লাগিয়েছিলেন দলবাজ কর্মকর্তাগণ। যদিও একই সংস্থার সংশ্লিষ্ট ব্যুরোর পরিচালিত জরিপে বলা হয়েছিল নির্বাচন যদি মোটামুটি সুষ্ঠু হয়, তাহলে কাদের সিদ্দিকী জয়লাভ করবেন।

এদিকে 'দলের' শীর্ষ পর্যায়ের নির্দেশে বিরোধী রাজনৈতিক দল ও নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে অপারেশন চালানোর পাশাপাশি অনেক কুরুচিপূর্ণ কাজে 'মাফিয়া চক্র' নিজেদের নিবেদিত করে। অনুসন্ধান চালিয়ে দেখা গেছে সরকারী নির্দেশে তারা যত না এ ধরনের তৎপরতা চালিয়েছে, তার চেয়ে নিজেরা উদ্যোগী হয়েই গ্রহণ করেছে এ ধরনের একটির পর একটি প্রকল্প। সূত্র মতে, এসব নোংরা তৎপরতার মধ্যে ছিল তদানীন্তন বিরোধী দলীয় নেত্রী সম্পর্কে অশ্লীল লিফলেট তৈরী ও বিতরণ, তার শিক্ষাগত যোগ্যতার প্রশ্নে সমন্বিত প্রচারণা, ক্যান্টনমেন্টের শহীদ মঈনুল রোডের বাড়ী নিয়ে বিতর্ক সৃষ্টি এবং হরতালের দিনে ওই বাড়ীর প্রবেশ পথে গাছের গুঁড়ি ফেলে

প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। জানা যায়, এই গ্রুপ বেগম জিয়া'র নিতান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে অত্যন্ত কুরুচীপূর্ণ খবর তৈরী করে কিছু কিছু পত্রিকায় প্রকাশের ব্যবস্থা করে। এমনকি সাবেক প্রেসিডেন্ট আব্দুর রহমান বিশ্বাসকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য এরা এক জঘন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ ক্ষেত্রে তারা এক মহিলাকে দিয়ে ব্যাপক প্রচারণার ব্যবস্থা করে, যাতে বলা হয় প্রেসিডেন্ট বিশ্বাসের সাথে নাকি ওই মহিলার বিয়ে হয়েছিল। সে সময় এই প্রচারনা ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টিতে যেমন সক্ষম হয়, তেমনি সাবেক প্রেসিডেন্টকেও মানসিকভাবে পীড়িত করে তোলে। তবে সব সময় এদের মূল লক্ষ্য ছিলেন- বেগম খালেদা জিয়া। তার পায়ের অসুখ, শিক্ষা, ব্যক্তিগত পর্যায়ে মনগড়া অশালীন লিফলেট তৈরী করে এই চক্র বিভিন্ন উপায়ে দেশের বিভিন্ন এলাকায় বিলি করত, সেনানিবাস এলাকাও এ থেকে বাদ যায়নি। বলতে গেলে বিকৃত মানসিকতাসম্পন্ন কর্নেল ইকবাল এসব করে যেন মজা পেতেন।

আশা করতেন দলের শীর্ষ পর্যায়ের নেকনজর। খাঁটি কর্মী হিসেবে স্বীকৃতির আত্মতৃপ্তিও তাকে মোহাচ্ছন্ন করে তুলত। অস্বীকার করার উপায় নেই, এগুলোর পুরস্কার হিসেবেই তিনি প্রমোশন পেয়ে ব্রিগেডিয়ার জেনারেল পদে উন্নীত হয়েছিলেন। পেয়েছিলেন ডিজিএফআই-এর উপ-মহাপরিচালক হওয়ার সুযোগ।
(দৈনিক ইনকিলাব ঃ ২৮/০১/২০০২)

আওয়ামী লীগ শাসনামলে ডিজিএফআই-৩

ঝড়ে ভেঙ্গে পড়ে বিদ্যুৎ টাওয়ার নির্দেশ আসে স্যাবোটাজ হিসেবে প্রচারের বৈরী গুপ্তচর সংস্থার কার্যক্রম মনিটরে নেমে আসে স্থবিরতা

আবু রুশদঃ বৃহত্তর খুলনার কোন এক এলাকায় একটি বড় বিদ্যুৎ টাওয়ার ভেঙ্গে পড়েছিল আওয়ামী লীগ শাসনামলে। ডিজিএফআই-এর শীর্ষ কর্মকর্তাগণ জানায়, পূর্বেই সরকারী মহল থেকে তাদের বলা হয়েছিল 'এটা বিরোধী দলের স্যাবোটাজ। যারা জড়িত তাদের খুঁজে বের করে যথাশীঘ্র সম্ভব রিপোর্ট দিন।' স্বভাবতই এমন জরুরী ও কঠোর নির্দেশ পেয়ে কর্মকর্তারা সাথে সাথেই তদন্তে নেমে পড়লেন। ঢাকা থেকে খুলনার ডিজিএফআই ডিটাচমেন্টকে বলা হলো ঘটনার প্রাথমিক তথ্য দেয়ার জন্য। তারা ঐদিনই জানালো ওটা ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙ্গে পড়েছে, স্যাবোটাজের কোন আলামত তখনো পাওয়া যায়নি। এরপরও পুরোপুরি নিশ্চিত হওয়ার জন্য পরদিন ঢাকা থেকে ঊর্ধ্বতন কর্তারা ঘটনাস্থলে গেলেন সরেজমিন তদন্ত করার উদ্দেশে। সবদিক বিচার-বিশ্লেষণ করে তারা দেখলেন- চিংড়ি ঘেরের লবণাক্ত পানিতে দাঁড়িয়ে থাকা বহুদিনের পুরনো টাওয়ারটিতে এমনিতেই লবণাক্ততার জন্য মরচে ধরেছিল। এ অবস্থায় যখন ঘূর্ণিঝড় প্রচন্ড বেগে আঘাত হানে তখন নিতান্ত বাস্তবিক কারণেই তা ভেঙ্গে পড়ে যায়। তদন্তের এই ফলাফল যথারীতি সরকারকে জানানো হলো। কিন্তু কে শোনে কার কথা। একদিকে সরকারী শীর্ষ মহল তাদের 'আবিষ্কার' প্রসঙ্গে অটল রইল, অপরদিকে ডিজিএফআই-এর অতি উৎসাহী ক্যাডারসুলভ কর্মকর্তারাও ব্যস্ত হয়ে পড়লেন ঘটনাটিকে স্যাবোটাজ হিসেবে প্রচার করার জন্য। যথারীতি বিভিন্ন পত্রিকায়

গোয়েন্দা সূত্রের উল্লেখ করে বলা হলো- ওটা স্যাবোটাজ, বিরোধী দলের অপকর্ম!

এভাবে আরো বহু ঘটনাকেই সে সময় ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা হত বিশেষ উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে। এক্ষেত্রে ডিজিএফআই'কে তার মূল কাজ থেকে সরিয়ে সার্বিকভাবে নিয়োজিত করা হয় ব্যক্তি ও দলীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য। এ ধরনের কাজে বেশীরভাগ শ্রম ও মেধা ব্যয় করার ফলে স্বভাবতই অন্যান্য জরুরী সেক্টরে নজর দেয়া ও তৎপরতা চালানোর মাত্রা আশঙ্কাজনক হারে হ্রাস পায়। জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার স্বার্থে বৈরী গুপ্তচর সংস্থার কার্যক্রম মনিটর করাসহ ট্রান্সফ্রন্টিয়ার ইন্টেলিজেন্সেও স্থবিরতা নেমে আসে। এ ব্যাপারে নাম না প্রকাশ করার শর্তে আ'লীগ আমলে ডিজিএফআই'তে কর্মরত একজন সিনিয়র গোয়েন্দা কর্মকর্তা জানান, আওয়ামী লীগ শাসনামলে রীতিমত নির্দেশ দিয়েই প্রতিবেশী দেশের গুপ্তচর সংস্থার ক্ষেত্রে সার্ভেইল্যান্সসহ সকল প্রকার তৎপরতা শতকরা ৯০ ভাগ কমিয়ে দেয়া হয়। তিনি বলেন, ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থাকে শুধু ফ্রী হ্যান্ড দিয়েই তদানীন্তন সরকার ক্ষান্ত হয়নি বরং স্পর্শকাতর বিষয়সমূহে কিভাবে ভারতকে সহায়তা করা যায় তাই ছিল তাদের মাথাব্যাথা। বিশেষ করে উত্তর-পূর্ব ভারতের স্বাধীনতাকামী গেরিলা গ্রুপগুলোর বিরুদ্ধে ভারতীয় ইন্টেলিজেন্সের সাথে সহযোগিতা প্রদানের নির্দেশ ছিল সকলের কাছে অবাক করা ব্যাপার। উক্ত কর্মকর্তা আরও জানান, একবার ডিজিএফআই সূত্রে ট্রানজিট ও গঙ্গার পানি প্রবাহ বিষয়ে বাংলাদেশের স্বার্থহানিকর ভারতীয় উদ্যোগের তথ্য পাওয়া যায়। নিয়মানুযায়ী তা সরকারকে জানানো হয়। কিন্তু পুরস্কৃত হওয়ার পরিবর্তে এসব বিষয়ে নাক না গলানোর জন্য বকাঝকা শুনতে হয় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে। এই বিষয়টি এখানেই শেষ হয়নি। বরং এই ঘটনার ২/৩ দিনের মাঝে ক'জন চিহ্নিত কলামিস্ট ডিজিএফআই-এর বিরুদ্ধে এমনকি এই সংস্থাকে বিলুপ্ত করার পক্ষে কলাম প্রকাশ করেন এবং ওই কর্মকর্তাকেও তড়িঘড়ি করে বদলী করে দেয়া হয় ডিজিএফআই থেকে। আওয়ামী লীগ শাসনামলে এভাবেই চলেছে ডিজিএফআই। এ সময় যোগ্য, সৎ অনেক কর্মকর্তা হয়েছেন রোষের শিকার। আবার দলীয় লেজুড়বৃত্তি করে অনেকেই নিজেকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন দন্ডমুন্ডের কর্তা বলে। এক্ষেত্রে এরা মানুষকে কষ্ট দিয়েছেন, তার অধিকার হরণ করেছেন। অবশ্য এমন অনেকও ছিলেন যারা তদানীন্তন সরকারী দলের শীর্ষ নেতা-নেত্রীর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হয়েও ক্ষমতার মোহে অন্ধ হয়ে যাননি। বরং ভদ্রতা ও যোগ্যতার সাথে দায়িত্ব পালন করেছেন। রাজনৈতিক দল হিসেবে এদেরই এ্যাসেট মনে করা উচিত আওয়ামী লীগের; পক্ষান্তরে চাটুকারদের মাথায় তুলে দায়দায়িত্ব নেয়ার প্রবণতা ত্যাগ করা উচিত সময় থাকতেই।

(দৈনিক ইনকিলাব ঃ ২৯/০১/২০০২)

যেভাবে যে কারণে 'স্বেচ্ছা অবসরে' চলে গেলেন মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান, বীর বিক্রম

আবু রুশ্‌দঃ বয়স হিসেবে চাকরির মেয়াদ সাত বছর বাকী থাকতেই অবসরে চলে যেতে হলো মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান বীর বিক্রমকে। বগুড়াস্থ ১১তম পদাতিক ডিভিশন থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় নেয়ার পর গতকাল ৬ সেপ্টেম্বর

২০০০ তারিখ থেকে শুরু হয়েছে তার অবসর প্রস্তুতিকালীন ছুটি বা এলপিআর। সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী গত ১৫ আগস্ট তারিখে সংঘটিত একটি অপ্রীতিকর ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণে 'বাধ্য হয়েছেন' এই অসম সাহসী মুক্তিযোদ্ধা। অবশ্য তার অবসর গ্রহণ নিয়ে ছিল দীর্ঘ জল্পনা-কল্পনা। বিশেষ করে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর যখন ২০ মে '৯৬-এর অভ্যুত্থান চেষ্টা প্রতিহতকারী সেনা কর্মকর্তাদের একে একে অবসর প্রদান করা হয় তখন মে. জে. ইমামুজ্জামানের ব্যাপারেও পাওয়া যায় একই রূপ অঘটনের আগাম পদধ্বনি। প্রাক্তন সেনাপ্রধান লে. জে. নাসিম-এর নেতৃত্বে পরিচালিত অভ্যুত্থান প্রক্রিয়াকে যেসব অসম সাহসী সেনা কর্মকর্তা রুখে দিয়েছিলেন, যাদের সময়োচিত পদক্ষেপে সংসদ নির্বাচনের সিঁড়ি বেয়ে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিল আওয়ামী লীগ, সেসব অফিসারদের ভাগ্য কখনোই সুপ্রসন্ন হয়নি। পুরস্কারের পরিবর্তে তাদের প্রত্যেকেই হয়েছেন নিগৃহীত। কয়েকজনকে অবসর প্রদান ছাড়াও যারা চাকরিতে বহাল থাকতে পেরেছেন তাদের সকলকেই পোষ্টিং দেয়া হয়েছে অনুল্লেখযোগ্য পোষ্টে। মে. জে. ইমামুজ্জামানও এর ব্যতিক্রম ছিলেন না। ১৯৯৬ সালের ২০ মে তিনি ঢাকার পার্শ্ববর্তী সাভারস্থ নবম পদাতিক ডিভিশনের জিওসি হিসাবে ট্যাংক পাঠিয়েছিলেন দেশের সংবিধান রক্ষার মহৎ উদ্দেশ্যে। কিন্তু এ সরকার ক্ষমতায় আসার অল্প কিছুদিনের মধ্যেই তাকে এই গুরুত্বপূর্ণ ডিভিশনের কমান্ড থেকে সরিয়ে এনে নিয়োগ করে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের প্রিন্সিপাল স্টাফ অফিসার বা পিএসও হিসাবে। এরপর এ বছরের প্রথমদিকে তাকে পাঠিয়ে দেয়া হয় ঢাকা থেকে বহুদূরে বগুড়ায় ১১ পদাতিক ডিভিশনে। এই ডিভিশনের জিওসি থাকাকালীনই গত ১৫ আগস্ট ঘটে যায় একটি অপ্রীতিকর ঘটনা। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা যায়, ১৫ আগস্ট 'জাতীয় শোক দিবস' উপলক্ষে গ্যারিসন মসজিদে ফজর নামাজের পর মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছিল অন্যান্য বছরের মত। সূত্র মতে, সেখানে নামাজ, মিলাদ ও মোনাজাত শেষে মে. জে. ইমামুজ্জামানের নির্দেশ মতে ইমাম সাহেব উপস্থিত সেনা কর্মকর্তা ও সৈনিকদের মসজিদ ত্যাগের অনুরোধ জানান। সকলকে ধীরস্থিরভাবে যাওয়ার সুযোগ করে দেয়ার জন্য জিওসি মসজিদের ভিতরে বসে থাকেন মিনিট দশেক। এরপর সবাই চলে গেছে ভেবে তিনি উঠে দাঁড়ান বাইরে বেরুনোর জন্য। সে সময় তার সাথে ছিলেন কর্নেল স্টাফসহ ১০/১২ জন সিনিয়র কর্মকর্তা। কিন্তু মসজিদের বারান্দায় এসে মে. জে. ইমাম দেখতে পান মসজিদ থেকে বের হওয়ার তিনটি পথই বন্ধ; সকলেই দাঁড়িয়ে আছেন আঙ্গিনায়। অথচ তাদের চলে যাওয়ার কথা দশ-বার মিনিট পূর্বেই। আদেশ পালিত হয়নি দেখে তৎক্ষণাৎ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেন মে. জে. ইমাম। তিনি জানতে চান কে, কেন এখনও গেট বন্ধ রেখেছে? জানতে পারেন ওসি এমপি অর্থাৎ অফিসার কমান্ডিং মিলিটারী পুলিশ জনৈক মেজর নির্দেশ দিয়েছেন নির্গমন পথ বন্ধ রাখার। কিন্তু কেন? জিওসিকে সবার আগে 'ঝামেলামুক্তভাবে' বের হওয়ার পথ করে দেয়ার উদ্দেশ্যেই ওসিএমপি অন্যদের বেরুতে দেননি। এটি সেনাবাহিনীর প্রচলিত অলিখিত 'সৌজন্যতা প্রকাশ' অস্বীকার করার উপায় নেই। কিন্তু মে. জে. ইমাম ১১ ডিভিশনের দায়িত্ব গ্রহণের পর মসজিদে এ ধরনের অপ্রয়োজনীয় সৌজন্য দেখাতে বার বার নিষেধ করেন বলে সূত্র জানিয়েছে। তাই জিওসি স্বভাবতই ধরে নেন যে, তার অর্ডার মানা হয়নি। ফলে তিনি উল্লিখিত

মেজরের ওপর ভীষণ ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন এবং অনেকটা উত্তেজিত হয়ে তাকে (মেজর এমন একটি শাস্তি প্রদান করেন যা বাহ্যিকভাবে খানিকটা দৃষ্টিকটু।

উল্লেখ্য, এ ঘটনার পরপর ঢাকা থেকে তাকে (জে. ইমাম) ওইদিনই তলব করা হয় সেনাসদরে এবং পরদিন অর্থাৎ ১৬ আগস্ট মেডিকেল চেকআপের নাম করে তাকে অনেকটা বাধ্য করা হয় সিএমএইচে ভর্তি হতে। এদিকে ঘটনা ঘটতে থাকে দ্রুত। বিভিন্ন মহলে চলে ঘটনা বিশ্লেষণ, জল্পনা-কল্পনা। শোনা যায় মে. জে. ইমাম নাকি 'বঙ্গবন্ধু'র বিরুদ্ধে কটাক্ষ করেছেন ও জাতীয় শোক দিবসের চেতনা তার পছন্দনীয় নয় বলেই অমন ঘটনা ঘটিয়েছেন ১৫ আগস্ট সকালে। পাশাপাশি তদন্ত পরিচালনার কাজও চলে নিয়মমাফিক। সূত্র মতে, তদন্তে মে. জে. ইমামের বিরুদ্ধে 'বঙ্গবন্ধু'কে কটাক্ষ করা সংক্রান্ত অভিযোগের সত্যতা না মিললেও তিনি যে একজন মেজরকে আনল' ফুলি পানিশমেন্ট দিয়েছেন তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এর প্রেক্ষিতে এক পর্যায়ে তাকে সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবে অবসর গ্রহণের তিনটি 'অপশন' দেয়া হয়। প্রাপ্ত তথ্য মতে, তাকে বলা হয়- হয় তাকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিতে হবে নতুবা তাকে শারীরিক কারণে অবসর দেয়া হবে এবং সর্বশেষ এ দুটোতে স্ব-ইচ্ছায় রাজি না হলে তাকে সরকার বাধ্য হয়েই চাকরিচ্যুত করবে। এ তিনটি বিকল্প জানার পর মে. জে. ইমাম স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন। এক্ষেত্রে ৫ সেপ্টেম্বর চাকরির মেয়াদ ৩০ বছর পার হওয়ার তারিখ বিধায় তিনি 'স্বেচ্ছায়' অবসর চেয়েছেন এমন ধারণাই দেয়া হয়েছে সরকারী মহল থেকে। এ 'যুক্তিতে' আপাতদৃষ্টিতে কোন অস্বাভাবিকতা না থাকলেও এ যাবৎ সেনাবাহিনীতে মেজর জেনারেল পদবীর কোন কর্মকর্তাকে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ৫৫ বছর বয়স হওয়ার পূর্বে অবসর দেয়া হয়নি। অথচ, জানা মতে. জে. জে. ইমামের বয়স হয়েছিল মাত্র ৪৮ বছর। এদিকে মে. জে. ইমামুজ্জামানের অকাল অবসর সম্পর্কে পরস্পরবিরোধী মন্তব্য পাওয়া গেছে বিভিন্ন সূত্র থেকে। 'লঘু পাপে গুরু দন্ড' দেয়া হয়েছে বলে মন্তব্য করে একজন অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা জানিয়েছেন, এ ধরনের ঘটনায় জিওসি সংশ্লিষ্ট অফিসারের কাছে মাফ চাইবেন এ শর্তে তাকে বগুড়া থেকে প্রত্যাহার করে যে কোন কম গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ দেয়াটাই হত স্বাভাবিক। বিশেষ করে একজন মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে এত বড় শাস্তি অন্ত ত তার প্রাপ্য ছিল না। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এর চেয়ে আরও গুরু অপরাধেও ইতিপূর্বে অনেক কর্মকর্তাকে লঘু শাস্তি দেয়া হয়েছে। এমনকি একজন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা এ সরকারের প্রথম পর্যায়ে অপসারিত লে. জে. নাসিম- গ্রুপের যোগসাজশে বিভিন্ন সিনিয়র সেনা কর্মকর্তার পোস্টিং অর্ডার সংক্রান্ত কাগজ যেটাতে জে. নাসিমের স্বহস্তে কারেকশন করা ছিল তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হওয়ার পর্যায়ে ধরা পড়েছিলেন। সেই দলিল একটি জাতীয় দৈনিকে ছাপাও হয়েছিল। কিন্তু তাকে চারিকুচ্যুত করা হয়নি। মুখ রক্ষার জন্য শুধু দেশের বাইরে পাঠিয়ে দেয়া হয়েছিল বছর দুয়েকের জন্য। এখন সেই কর্মকর্তা আবার সক্রিয় হয়েছেন দাপটের সাথে। অথচ, এই একই সরকার ২০ মে '৯৬-এর ক্যুদেতা প্রতিহতকারী প্রায় সকল কর্মকর্তাকেই অপসারণ করেছেন সেনা চাকরি হতে। এর শেষ বলি হলেন মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামান। উল্লিখিত অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তার মতে, মহান মুক্তিযুদ্ধে আহত এই কর্মকর্তা যিনি পাঁচ ওয়াক্ত

নামাজ পড়েন নিষ্ঠার সাথে,প্রতিবার আলোচনা শুরুর পূর্বেই যিনি উচ্চারণ করেন 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' তার অকাল অবসর হয়তো অনেকের জন্য আনন্দের সংবাদ হতে পারে, কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে অর্জিত স্বাধীন বাংলাদেশ সাংবিধানিক ধারাবাহিকতার ফসল আ'লীগ সরকার। সকলের কাছেই প্রশ্ন হয়ে থাকবে রাজনীতি, লবিং, গ্রুপিং সেনাবাহিনীতে চলবে আর কতকাল?

অন্যদিকে, একপক্ষ মে. জে. ইমামুজ্জামান অ-অফিসার সুলভ ব্যবহার করেছেন, বেআইনী আদেশ দিয়েছেন জুনিয়রকে এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে অবসর প্রদানে কোন অনৈতিকতা দেখতে পাননি। তাদের মতে, তার ব্যাপারে যে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে তাতে দোষের কিছু নেই।

পক্ষে বিপক্ষে মতামত যাই থাকুক, একথা তো অস্বীকার করার উপায় নেই যে, দীর্ঘদিন জে. ইমাম ছিলেন মানসিক চাপের মুখে। অব্যাহত নজরদারী, প্রফেশন্যাল বৈরীতা ইত্যাদিতে তার মনের অবস্থা ছিল খুবই নাজুক। একজন মুক্তিযোদ্ধা হওয়ার পরও 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা বাস্তবায়নের সুবর্ণ সময় কাছেই মনে হয়েছে। চাকরি জীবনের শেষ পদে এসে তাই তাকে আদেশবলে অবরুদ্ধ থাকতে হয়েছে সিএমএইচ-এ। অনুসন্ধান করে দেখা গেছে, তার অসুস্থতার কোন প্রমাণ পাননি চিকিৎসকরা। অথচ, তার ভিভিআইপি রুমের দরজার ভিতরের দিকের লক অপসারণ করা হয়েছিল বিশেষ নির্দেশে এবং দীর্ঘ প্রায় দু'সপ্তাহ কোন ওষুধ ছাড়াই তিনি ছিলেন অনেকটা অবরুদ্ধ। জল্পনা-কল্পনা, বাস্তব-বিশ্লেষণ যাই হোক না কেন, সেনাবাহিনী থেকে মেজর জেনারেল ইমামুজ্জামানের বিদায় কোন স্বাভাবিক ঘটনা নয়। যে অভিযোগে তাকে অবসর দেয়া হয়েছে তাকে হতাশার পরিণতিও বলা যায়। ইতিপূর্বে অপর একজন মেধাবী কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার শাবাবের ক্ষেত্রেও ঘটেছে হতাশার বিস্ফোরণ। তার জমজ ভাই ব্রিগেডিয়ার ফারুক আশফাকও চলে গেছেন 'স্বেচ্ছা অবসর' নিয়ে। কিন্তু কেন, কি কারণে এসব হতাশা সৃষ্টি হচ্ছে সিনিয়র অফিসারদের মাঝে তা যেন বরাবরই থেকে যাচ্ছে পর্দার আড়ালে। জে. ইমামও এর ব্যতিক্রম কিছু নন।(**দৈনিক ইনকিলাব ঃ ০৭/০৯/২০০০**)

সেনাবাহিনীর পোষাক পরে সৈনিকদের মাঝে শেখ হাসিনা বক্তৃতা করছেন।

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় লালিত সন্ত্রাসের কালো থাবা থেকে সেনা কর্মকর্তারাও নিরাপদ নন

আবু রুশ্‌দ॥ রাজনৈতিক প্রশ্রয়ে পরিচালিত খুন, ডাকাতি রাহাজানি বেসামরিক জনজীবনে এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার হলেও সাম্প্রতিকালে এর কালো থাবা সামরিক সদস্যদের মাঝেও বিস্তৃত হয়েছে। দেশের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির কতটা অবনতি হলে সাধারণ দুষ্কৃতিকারী হতে শুরু করে রাজনৈতিক প্রভাবশালী মহলের ছত্রছায়ায় লালিত সন্ত্রাসী চক্র নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তাদের ওপর শারীরিক হামলা চালাতে পারে তা-ই এখন প্রশ্নসাপেক্ষ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে দেশে যখন সামরিক শাসন, নেই, নেই সেনা সদস্যদের বিরুদ্ধে গণরোষের প্রশ্ন, তখন সামরিক কর্মকর্তার পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবগত হয়ে তার ওপর হামলে পড়া কোন বিচ্ছিন্ন মামুলি ব্যাপার হতে পারে না। বরং ঘটনা বিশ্লেষণে পর্যবেক্ষকগণ এ ধারণাই করছেন যে একটি বিশেষ মহল যারা ঐতিহ্যগতভাবে সেনাবাহিনীবিদ্বেষী মনোভাব পোষণ করে আসছেন, এসব ঘটনা তাদের গোপন মনোভাবের রুদ্র বহিঃপ্রকাশ বই কিছুই নয়। সেজন্য আমরা অমুক সংগঠনের নেতা, অমুক দলের সদস্য, তাই আমাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করতে পারবে না- এ মানসিকতা থেকেই তারা আনচ্যালেঞ্জডভাবে নিশ্চিন্তে চড়াও হচ্ছেন সেনা কর্মকর্তাদের ওপর। এদিকে মাত্র এক মাসের ব্যবধানে একজন মেজর পদবীর কর্মকর্তা ও একজন ক্যাপ্টেনের ওপর শারীরিক হামলা হওয়ার প্রেক্ষিতে সেনা কর্মকতা এবং সাধারণ সেনা সদস্যদের মাঝে তীব্র অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে আভাস পাওয়া গেছে। দীর্ঘদিন যাবত রাজনীতির বাইরে থেকে সশস্ত্র বাহিনী একটি নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করলেও এ ধরনের ঘটনাকে অনেকেই একটি চিহ্নিত মহলের সেনা ইনস্টিটিউশন বিরোধী ঘৃণা, বিদ্বেষের উৎকট প্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করছেন। এক্ষেত্রে গত ২৩ মে বিকেলে বরিশাল শহরে জেলা যুবলীগ সম্পাদক ফজলুল করীম শাহীন ও তার সহযোগী ক্যাডার মীরাজ কর্তৃক ক্যাপ্টেন ফিরোজ ও তার খালাত ভাইকে মারধর করা ও মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন বিশ্লেষকগণ। উক্ত ঘটনায় ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার করার নির্দেশ দিলেও বাস্তবে তা পালন করা হয়নি বলে জানা গেছে। ঘটনার বিবরণে আরো জানা যায়, সাভার সেনানিবাসে কর্মরত আর্টিলারী কোরের কর্মকর্তা ক্যাপ্টন ফিরোজ ছুটিতে বরিশালস্থ নিজ বাড়ীতে বেড়াতে আসেন। ২৩মে বিকেলে উক্ত কর্মকর্তা তার খালাত ভাই মনিরকে নিয়ে বাসার টেলিফোনের বিষয়ে অভিযোগ জানানোর জন্য স্থানীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জে যান। এ সময় একজন প্রকৌশলীর চেয়ারে বসা জেলা যুবলীগ সম্পাদক ও ফ্যাক্স ফোন ব্যবসায়ী 'ফেইথ শাহীনে'র সাথে ক্যাপ্টেন ফিরোজের বাক-বিতণ্ডা হয়। ঐ সেনা কর্মকর্তা নিজ পরিচয় দেয়ার পরও লাঞ্ছনার শিকার হন। এরপর যুবলীগ সম্পাদক তার ফ্যাক্স-ফোনের দোকানে ক্যাপ্টেন ফিরোজের খালাত ভাই মনিরকে ডেকে নিয়ে আটকে রেখে মারধর ও নির্যাতন করে। এমনকি মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে হত্যার হুমকি দেয়। এর কিছুক্ষণ পরে 'ফেইথ শাহীন' তার সহযোগী ক্যাডার মিরাজসহ পুনরায় টিএন্ডটি এক্সচেঞ্জে গিয়ে ক্যাপ্টেন ফিরোজের ওপর চড়াও হয়ে তাকে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করে এবং ক্ষুর বের করে হত্যার হুমকি দেয়।

এভাবে পরিচয় জানার পর একজন সেনা কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করেই বরিশাল জেলা যুবলীগ সম্পাদক ক্ষান্ত হননি, বরং তাকে যাতে গ্রেপ্তার করা না হয় সেজন্য তিনি প্রভাবশালী মহলেও যোগাযোগ শুরু করে দেন। ফলশ্রুতিতে যে ঘটনায় জেলা যুবলীগ সম্পাদকের বিরুদ্ধে জননিরাপত্তা আইনে মামলা হওয়ার কথা সেখানে তিনি দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছেন মহাপরাক্রমশালীর মত বুক ফুলিয়ে। প্রশাসন এখানে নীরব, অসহায়, এ যাবত একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা ছাড়া তারা আর কিছু করতে পারেনি। আদৌ কিছু করতে পারবে কি-না তা নিয়েও সকলে সন্দিহান বলে জানিয়েছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন সেনা কর্মকর্তা। তিনি আরো বলেন, দেশে যখন সামরিক শাসন থাকে তখন সেনাসদস্যদের সাথে জনগণের ইন্টার‍্যাকশন হওয়ায় অপ্রীতিকির ঘটনা ঘটতে পারে। কিন্তু এখন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে দেশ পরিচালিত হওয়ায় এ ধরনের ঘটনা একদিকে যেমন অস্বাভাবিক তেমনি অনাকাংক্ষিতও বটে। বরিশালের ঘটনার উল্লেখ করে তিনি মন্তব্য করেন, যদি কোন সেনা কর্মকর্তা কারো সাথে অপ্রিয় কোন ব্যবহার করেন তাহলে তা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবগত করাটাই হত যথার্থ।

কিন্তু এ ক্ষেত্রে একটি রাজনেতিক দলের দায়িত্বশীল একজন কর্মকর্তা জেনেশুনে যা করেছেন তা কখনই সুসভ্য আচরণের পর্যায়ে পড়ে না। রাজনৈতিক নেতৃত্ব যদি এবাবে অপ্রীতিকার ঘটনা সংঘটনে ইন্ধন জোগান তাহলে প্রচলিত নিয়ম, রীতি, প্রথার প্রতি জনগণের শ্রদ্ধাবোধ থাকবে কিভাবে এ প্রশ্নও তিনি করেছেন।

এদিকে, বরিশালে সেনা কর্মকর্তা প্রহৃত হওয়ার মাসখানেক পূর্বে ঢাকার সন্নিকটে জিরাবো রোডের বড় রাঙ্গামাটিয়া নামক স্থানে সেনাবাহিনীর অপর একজন কর্মকর্তা মেজর ওবায়দুল করিম স্থানীয় সন্ত্রাসীদের দ্বারা মারাত্মকভাবে আহত হন। জানা যায়, সাভার ক্যান্টনমেন্টের ১ ফিল্ড রেজিমেন্ট আর্টিলারীর উক্ত কর্মকর্তা গত ২১এপ্রিল রাতে ঢাকা থেকে সাভার সেনানিবাসে ফেরার পথে সন্ত্রাসী কর্তৃক আক্রান্ত হন। পরিচয় দেওয়ার পরও সন্ত্রাসীরা মেজর ওবায়দুল করিমকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করা থেকে বিরত হয়নি। অভিযোগ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট থানাকে ঘটনা জানানোর পরও বিশেষ কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। ফলে সেনাসদস্যদের মাঝে দেখা দেয় তীব্র ক্ষোভ, যা এখনো স্তিমিত হয়নি বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্ট একটি সূত্র। এ নিয়ে পরবর্তীতে সাভার সেনানিবাসস্থ সেনাসদ্যদের সাথে স্থানীয় এলাকাবাসীর অপ্রীতিকর ঘটনাও ঘটে।

অল্প সময়ের ব্যবধানে সেনা কর্মকর্তাদের ওপর এ ধরনের শারীরিক আক্রমণের ঘটনা হয়ত আপতদৃষ্টিতে বাংলাদেশের সামগ্রিক অবনতিশীল আইন-শৃংখলা পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যহীন কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু অবসরপ্রাপ্ত একজন বায়োজ্যেষ্ঠ সেনা কর্মকর্তার মতে, এখন যেভাবে প্রকাশ্যে মানুষ হত্যা করে রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়ানো যায় সেখানে এ ধরনের ঘটনা ঘটা হয়ত অস্বাভাবিক মনে হবে না।

তবে এতে সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের ভাবমূর্তি কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে তা সাধারণ জনগণের মত তাদেরও অনুধাবন করা উচিত। অবশ্য উক্ত কর্মকর্তার মতে এ ধরনের অপকর্ম ঐ মহলটির কাছে নতুন কিছু নয়। বরং স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়েও

তারা এভাবে একজন সেনাকর্মকর্তার স্ত্রীকে প্রকাশ্যে অপদস্থ করেছিল। পরে তদানীন্তন সরকার অপরাধীদের বিচার না করে উল্টো উক্ত সেনা কর্মকর্তাকে চাকরিচ্যুত করেন। আবার ঐ দলের শাসনামলে শাসকদলীয় ক্যাডার নেতার হাতে সেনা কর্মকর্তার লাঞ্ছিত হওয়ার বিষয়টি যারপর নাই উদ্বেগের বিষয়। (দৈনিক ইনকিলাব ৩১/০৫/২০০০)

এক ঢিলে দুই পাখি মারার সরকারী কৌশলঃ সেনাকুঞ্জের অনুষ্ঠান নিয়ে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে বিরোধী দলগুলোর ব্যবধান সৃষ্টির অপপ্রয়াস

রাজনৈতিক সংকট নিরসনে অনাগ্রহের অপবাদ বিরোধী দলের ঘাড়ে চাপানোর কৌশল

আবু রুশদ ।। ২১ নভেম্বর সশস্ত্রবাহিনী দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেনাকুঞ্জের সংবর্ধনায় বিরোধী দলীয় নেত্রীসহ অপরাপর উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বকে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে যে জটিলতার সৃষ্টি করা হয়েছে, রাজনৈতিক পর্যবেক্ষক মহল তাকে সশস্ত্রবাহিনীর সাথে বিরোধী রাজনীতিকদের ব্যবধান সৃষ্টির একটি সূক্ষ্ম প্রয়াস বলে উল্লেখ করেছেন। পর্যবেক্ষক মহলের মতে বর্তমান সরকার যেভাবে রাষ্ট্রীয় বেসামরিক প্রশাসন ও প্রচার মাধ্যমের সাথে বিরোধী দল ও এর নেতা-কর্মীদের দূরতিক্রম্য ব্যবধান সৃষ্টি করেছেন ঠিক একই পথে সশস্ত্রবাহিনী থেকেও ক্রমান্বয়ে দেশের ৬৭% জনগণের প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলগুলোকেও দূরে সরিয়ে রাখার কৌশল গ্রহণ করছেন হীন উদ্দেশ্য নিয়ে। যদিও সশস্ত্রবাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণপত্র বেগম খালেদা জিয়াসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে হস্তান্তর নিয়ে আইএসপিআর থেকে তড়িঘড়ি একটি ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়, কিন্তু তারপরও সার্বিক ঘটনা বিশ্লেষণে এ ব্যাপারে সরকারের কূটকৌশল গ্রহণের বিষয়টিই অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে সচেতন সকলের চোখে ধরা পড়েছে। কারণ, এবারই যে প্রথমবারের মতো বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলোর সাথে এ ধরনের ন্যক্কারজনক আচরণ করা হয়েছে তা নয়, বরং ইতোপূর্বেও বহুবার সেনানিবাস ও সশস্ত্রবাহিনীর কথিত নিরাপত্তার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীদের হয়রানি করা হয়েছে। উল্লেখ্য, আ'লীগ সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর অলিখিত-লিখিত উভয়ভাবেই বিরোধী দলীয় নেতা-কর্মীদের ক্যান্টনমেন্টে প্রবেশ ও বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানে বাধা প্রধান করা শুরু হয়। এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে অনেক জাতীয় পর্যায়ের নেতৃবৃন্দকে পর্যন্ত প্রত্যক্ষভাবে হেনস্তা করা হয় ও তারা ঘোষিত হন 'পার্সনা নন গ্রাটা' অর্থাৎ অবাঞ্ছিত ব্যক্তি হিসেবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে অত্যন্ত সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব জনাব আনোয়ার জাহিদের নাম যেমন উদাহরণ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় তেমনি অবসরপ্রাপ্ত সিনিয়র সেনা কর্মকর্তা ও বিএনপি নেতা মেজর জেনারেল জেড এ খান ও ব্রিগেডিয়ার আনোয়ার হোসেন চৌধুরী নামও উল্লেখ করতে হয়।

এদিকে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দকে এভাবে সরাসরি অবাঞ্ছিত ঘোষণার পাশাপাশি বিরোধী দলীয় বিশেষ করে বিএনপি'র নেতা-কর্মী যারা বেগম খালেদা জিয়ার সাথে দেখা করার উদ্দেশ্যে তার সেনানিবাসস্থ শহীদ মইনুল রোডের বাসভবনে যাওয়ার জন্য সেনানিবাসের প্রবেশদ্বারে যেতেন তাদেরকেও যেনতেন উপায়ে হয়রানি করা

হয়েছে বারবার। এ পর্যায়ে এভাবে উত্যক্ত হওয়া ও হয়রানির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য বিএনপি'র নেতা-কর্মীরা বেগম জিয়ার বাসায় যাওয়া বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। এছাড়া স্বয়ং বেগম খালেদা জিয়াকে তার স্মৃতিময় বাসভবনে থেকে উচ্ছেদ করার জন্যও সরকার বিভিন্ন কূটিল পথের আশ্রয় নিতে শুরু করে। বিভিন্ন সময়ে সরকার যেমন বেগম জিয়ার বিরুদ্ধে বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে 'তথ্য' সরবরাহ করে রিপোর্ট প্রকাশে উৎসাহ যুগিয়েছেন তেমনি বিরোধী নেত্রীর বাসভবনের সামনে গাছের গুড়ি, ইট ফেলে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির প্রচেষ্টাও চালিয়েছেন। এরই একপর্যায়ে ক'মাস পূর্বে সেনাকুঞ্জে আয়োজিত বিরোধী দলীয় উপনেতা ডাঃ এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরীর মেয়ের বিয়ের অনুষ্ঠানটিও অদৃশ্য সুতোর টানে পণ্ড হয়ে যায়। সেবার সেনানিবাসের কথিত নিরাপত্তা রক্ষার নামে উক্ত অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বিশিষ্ট রাজনীতিকদের এমনকি নির্বাচিত সংসদ সদস্যদেরও সেনানিবাসের গেট থেকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। মূলত বিরোধী রাজনৈতিক দলের কোন নেতা যাতে ভবিষ্যতে হয়রানি ও অপমান এড়ানোর জন্য সেনাকুঞ্জে অনুষ্ঠান আয়োজনে আগ্রহী হয়ে না ওঠেন তা নিশ্চিত করার জন্যই এ ধরনের 'নিরাপত্তা রক্ষার' অজুহাত দাঁড় করানো হয় বলে বিশ্লেষকদের অভিমত। এসব ছাড়াও পরোক্ষভাবে সশস্ত্র বাহিনীর যে কোন বিজ্ঞাপন বিরোধী দল সমর্থক পত্র-পত্রিকাতে সরবরাহেও সরকার অলিখিত নির্দেশ জারি করে।

সেনাকুঞ্জের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো নিয়ে যে ভজঘট পাকানো হয়েছে তাকেও সচেতন মহল সরকারের কূটকৌশল হিসেবেই চিহ্নিত করেছেন। তাদের মতে, এটা সরকারের এক ঢিলে দুই পাখি মারার অপচেষ্টা বই কিছুই নয়। এতে একদিকে যেমন বিরোধী দলের সাথে সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবধান বা মনকষাকষির সৃষ্টি করা সম্ভব, তেমনি অনুষ্ঠানে বিরোধী নেতৃবৃন্দ আসেননি এ অজুহাতে প্রধানমন্ত্রী তাদের সাথে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে পারেননি এই অপবাদের তিলকও বেগম জিয়ার কপালে লিখে দেয়া সহজ। এ ব্যাপারে ইতোমধ্যেই সরকার সমর্থক পত্র-পত্রিকাগুলো তারস্বরে বলছে যে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী সশস্ত্র বাহিনী দিবসের অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক অচলাবস্থা নিয়ে বিরোধী দলীয় নেত্রীর সাথে আলাপ করবেন বলে যে 'সদিচ্ছা' প্রকাশ করেছিলেন বিরোধী নেতৃবর্গ সেনাকুঞ্জে না গিয়ে প্রকারান্তরে সেই 'মহৎ' উদ্যোগ বানচাল করে দিয়েছেন। লক্ষণীয় দুই নেত্রীর আলোচনা রাজনৈতিক ব্যাপার হলেও যে অনুষ্ঠানে এ আলোচনা হবার কথা ছিল তা কিন্তু সশস্ত্র বাহিনী কেন্দ্রিক, যেখানে সশস্ত্র বাহিনী দলমতের উর্ধ্বে জাতীয় চরিত্রের ধারক-বাহক এবং এই অনুষ্ঠানের আমন্ত্রণ ও আসা-না আসা নিয়ে ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের চেষ্টা প্রকারান্তরে ইনস্টিটিউশন হিসেবে সশস্ত্র বাহিনীর কাঁধেই বর্তায়। অর্থাৎ মান-অভিমান, রেষারেষি যাই হোক, তা যেন সশস্ত্র বাহিনীর গা ছুঁয়েই যায় এটাই ছিল সরকারের গোপন লক্ষ্য।

উল্লেখ্য, সশস্ত্র বাহিনী সরকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে রাজনৈতিক দলের মত বা সরকারের মত নিজেদের ডিফেন্ড করতে পারে না। শুধু পারে সরকারী নির্দেশে আইএসপিআর নামের একটি সংস্থা থেকে ব্যাখ্যা পাঠাতে। এক্ষেত্রে আইএসপিআর-এর ব্যাখ্যা থেকেও সরকারের কূটকৌশলের আঁচ পাওয়া যায়। বেগম জিয়া ও অন্যান্য বিরোধী দলীয় নেতৃবর্গকে দাওয়াত কার্ড পাঠানো নিয়ে আইএসপিআর বলেছে যে, জনৈক স্কোয়াড্রন লিডার নাকি বিরোধী দলীয় নেত্রীর বাসভবনে সকাল ৯টায় গিয়ে

শুনতে পান তিনি ঘুমাচ্ছেন। তাই তিনি সিকিউরিটি ইনচার্জকে দাওয়াতপত্র দিয়ে রিসিভড কপি নিয়ে চলে আসেন। পাশাপাশি জনাব সাইফুর রহমান ও আবদুল মান্নান ভূঁইয়াকে না পাওয়ায় আমন্ত্রণপত্র পরে পৌঁছানো হয়। যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেয়া যায় বেগম জিয়া ঘুমাচ্ছিলেন বলে তাকে সশরীরে কার্ড দেয়া সম্ভব হয়নি, কিন্তু তারপরও বলতে হয় তিনি (বেগম জিয়া) এমন একজন ব্যক্তিত্ব যাকে ২ঘন্টা পরে যোগাযোগ করেও কার্ড দেয়া যেত। আর জনাব সাইফুর রহমান ও মান্নান ভূঁইয়া অখ্যাত কোন নাম-ঠিকানাবিহীন ব্যক্তি নন যে, তাদের সময়মত কার্ড দেয়া সম্ভব ছিল না। বলতে গেলে এবার সেনাকুঞ্জের অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ নিয়ে সরকার যা করেছে ও পরবর্তীতে আইএসপিআর মারফত যে প্রেসনোট দিয়েছে তা 'গরু মেরে জুতো দান' বই কিছুই নয়। অন্যদিকে এ প্রক্রিয়ায় সরকার সশস্ত্র বাহিনীকেও বিরোধী দলের কাছে অপ্রিয় বা ডিফেম (Defame) করার সুক্ষ্ম প্রচেষ্টা চালিয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনী মুক্তিযুদ্ধের যে দিনটিতে গঠিত হয়েছিল সেই মুক্তিযুদ্ধের প্রথম রেগুলার ব্রিগেড 'জেড' ফোর্সের অধিনায়ক জেনারেল জিয়াউর রহমানের পত্নী সেই দিনকে উপলক্ষ করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার মত পরিবেশ পাননি।

এভাবে দেশের প্রায় ৬৭ ভাগ মানুষ যারা রাজনৈতিকভাবে আ'লীগের আদর্শের সাথে যে কোন কারণেই হোক একাত্ম নয়, তাদের প্রতিনিধিদের সাথে দিন দিন সশস্ত্র বাহিনীর ব্যবধান সৃষ্টি করা হচ্ছে। রাজনীতি বিশ্লেষকদের মতে, এর পরিণতি ভয়াবহ হতে বাধ্য। কারণ সশস্ত্র বাহিনী কোন দল বা বিশেষ কোন আদর্শের ধারক-বাহক বা পালনকারী হতে পারে না বরং এটি আক্ষরিক অর্থেই একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান, যেখানে আ'লীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগের যেমন সম্পৃক্ততার যুক্তি আছে, তেমনি বিএনপি, জাপা, জামায়াতসহ বাকি সকলেই সমান আবেগ নিয়ে একাত্ম। এ আবেগ, এ সম্পর্ক, সব বিতর্ক, সব রাজনীতির বাইরে থাকুক-এটাই সকলে প্রত্যাশা করে। **(দৈনিক ইনকিলাব ২৩/১১/৯৯)**

যৌথ সামরিক মহড়ার নামে বাংলাদেশের নদীপথ ভূপ্রকৃতি ও গোপন স্থাপনার ছবি তুলে নিয়ে গেলেন ভারতীয় সেনা সদস্যরা

স্টাফ রিপোর্টার॥ সম্প্রতি ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সামরিক মহড়ার আড়ালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্য কর্তৃক প্রকাশ্যে উত্তরাঞ্চলের নদ-নদী ও অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনার ছবি ও ভিডিও গ্রহণের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, গত ১ এপ্রিল 'ভারত-বাংলাদেশ যৌথ নদী র‍্যাফট অভিযান' নামে নদীপথে একটি সামরিক মহড়া শুরু হয় ভারতের গ্যাংটক থেকে। তিস্তা নদীর উৎসমূলে শুরু হওয়া এই যৌথ মহড়ার লক্ষ্য ছিল নদীপথে নৌকা বেয়ে অর্থাৎ র‍্যাফটিং করে বাংলাদেশের তিস্তা নদীপথে মহড়া পরিচালনা করা। এ মহড়ায় মেজর চিকারা (Major Chikara) ও একজন ক্যাপ্টেন পদবীর কর্মকর্তাসহ মোট ১১ সদস্যের একটি ভারতীয় সেনাদল অংশ নেয়। অপরপক্ষে বাংলাদেশ পক্ষে ছিলেন ১২ সদস্যের একটি সেনাগ্রুপ। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি নিরীহ সামরিক মহড়া হলেও এর আড়ালে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যদের ব্যাপকহারে পর্যবেক্ষণ অর্থাৎ রিকনাইস্যান্স (Reconnaisance) চালানোই যে মূল উদ্দেশ্য ছিল তা তাদের বিভিন্ন তৎপরতা থেকে স্পষ্ট হয়ে গেছে। জানা যায়, যৌথ মহড়া দলটি মিলিটারী ভার্সন নৌকা বা র‍্যাফট নিয়ে বাংলাদেশের নদী সীমানায় প্রবেশ করে গত ৬ এপ্রিল। সীমান্ত এলাকায় প্রবেশ করার মুহূর্ত থেকে ভারতীয় দলটি নদীপথের ও এর পার্শ্ববর্তী এলাকার ছবি তোলা এবং ভিডিও ধারণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। এ তথ্য দিয়ে সূত্র জানিয়েছে যে, তিস্তা নদীর কোথায় কত গভীরতা, তলদেশের প্রকৃতি কিরূপ, এর পাড় কতটুকু খাড়া-এসব অনুপুংখ তথ্য সংগ্রহে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কোন বিরতি লক্ষ্য করা যায়নি। এমনকি এ দলটি বাংলাদেশী কর্তকর্তাদের প্রতিবাদের মুখেও অনেকটা ড্যামকেয়ারভাবে তিস্তা ব্যারেজ প্রকল্পের এ-টু-জেড ছবি ক্যামেরা ও ভিডিওবন্দী করে। এতে সরকারী পর্যায়ে গা ছাড়া ভাব দেখে পরবর্তী সময়ে কেউ আর বাধা দিতে উৎসাহবোধ করেননি বলে সূত্র জানায়।

এভাবে একটি স্বাধীন দেশে যেখানে সরকারী পর্যায়ে অহোরাত্রি স্বাধীনতার চেতনার কথা প্রচারিত হয়ে আসছে সেখানে কোন রাখঢাক না করেই ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সদস্যরা এখন পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম চালানোর সুযোগ পাচ্ছে। অথচ, অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা বা KPI-তে বাংলাদেশের যে কোন নাগরিকের প্রবেশধিকার যেমন সংরক্ষিত, তেমনি ছবি তোলা বা ম্যাপ তৈরি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। এছাড়া নদীপথসহ সমতল ভূমিতেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ভিন্ন কেউ জরিপ চালাতে পারেন না বলেই সরকারী আইনে বলা আছে। কারণ, মাটির প্রকৃতি কিরূপ, এটি ট্যাংক বা সামরিক যানবাহন চলাচলের উপযুক্ত কিনা ইত্যাদি তথ্য, যা সামরিক অভিযান পরিচালনার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ, সেসব সঙ্গত কারণেই 'অতিস্পর্শকতার' বিষয়। পাশাপাশি KPI অর্থাৎ অতিগুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা, যেমনঃ কাপ্তাই বাঁধ, তিস্তা ব্যারেজ এগুলোর ছবি তোলাও নিষিদ্ধ। কারণ, এর কোথায় বোমা বসিয়ে বা যুদ্ধাবস্থায় বিমান বা কামান থেকে বোমা নিক্ষেপ করে কিভাবে এটি ধ্বংস করা যাবে ছবি সংগ্রহ করে তা সহজেই বুঝতে পারা যায়। ফলে সকল রাষ্ট্র তার ভূপ্রকৃতি বা Terrain Condition যেমন অপর কোন রাষ্ট্রকে

প্রত্যক্ষভাবে জানতে দেয় না, তেমনি KPI -এর ক্ষেত্রেও আরোপ করা হয় বিস্তর বিধিনিষেধ।

কিন্তু অবিশ্বাস্য হলেও এখন 'সম্ভাব্য শত্রু' দেশের সেনা সসদ্যরা এদেশে প্রবেশ বা 'মিলিটারী অ্যাপ্রোচ'-এর ভিডিও করে যেন আমাদের সকল 'চেতনা'কেই ব্যঙ্গ করে গেলেন। এমনকি এ দলটির সাথে স্যাটেলাইট টেলিফোন বহনেরও অভিযোগ পাওয়া গেছে। এদের এ ধরনের তৎপতার পাশাপাশি সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য থেকে আরও জানা যায় যে, যৌথ সামরিক মহড়া শুরু হওয়ার আগে ঢাকাস্থ সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ অর্থাৎ Armed Forces Division ও রংপুরসহ সংশ্লিষ্ট এলাকার সকল থানায় ও প্রশাসনিক দফতরে ভারতীয় সেনা সদস্যদের সহায়তাদানের জন্য চিঠি দেয়া হয়। একই সাথে এই কথিত মহড়া চলাকালীন ঢাকাস্থ ভারতীয় হাইকমিশনের সহকারী ডিফেন্স অ্যাটাশে জনৈক স্কোয়াড্রন লিডার ও তার এক সহকারী রংপুর সেনানিবাসে অবস্থান করেন। ১১ এপ্রিল গাইবান্ধার বালাসী ঘাটে মহড়া শেষ হওয়ার পর ভারতীয় সেনাদলটি ১৪ এপ্রিল ঢাকায় চলে আসলো ও ১৮ এপ্রিল ভারতে চলে যায়। এর আগে এরা রংপুর ও বগুড়া সেনানিবাসে যায় 'পরিদর্শনের'জন্য। উল্লেখ্য ঢাকায় আসার পথে এদের বহনকারী গাড়ীটি বগুড়া অঞ্চলের একটি থানায় ওসি ও তার পরিবারকে বহনকারী মাইক্রোবাসটির সাথে দুর্ঘটনায় পতিত হয়।

এদিকে এভাবে আমাদের নদীপথ, ভূখণ্ড ও গুরুত্বপূর্ণ স্পর্শকাতর স্থাপনার ছবি ও ভিডিওকরণ সম্পর্কে পর্যবেক্ষক মহল একাধারে চরম ক্ষোভ ও বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। এ ব্যাপারে তাদের মত হল, ভারত স্যাটেলাইট দিয়ে বা গুপ্তচর পাঠিয়ে যেসব তথ্য প্রত্যক্ষভাবে কখনই সংগ্রহ করতে পারত না, এখন যৌথ মহড়ার আড়ালে সরকারের নাকের ডগায় বসেই সেসব তথ্য নিয়ে গেল নির্বিঘ্নে, বীরদর্পে। এটি যেমন এ দেশের গোপনীয়তাকে লংঘন করেছে, তেমনি স্বাধীন দেশ হিসেবে আমাদের মর্যাদাকেও খাটো করেছে মারাত্মকভাবে। **(দৈনিক ইনকিলাব, ০১/০৫/২০০০)**
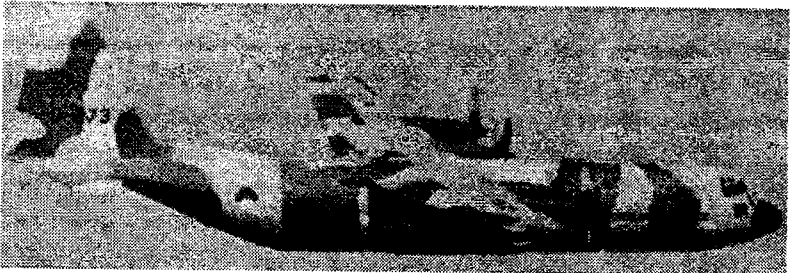
সি-১৩০

চার বছরে অনেক সেনাসদস্য লাঞ্ছিত হলেও দায়ীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়নি

আবু রুশ্দ ॥ অতি সম্প্রতি পুলিশের জনৈক নায়েকের হাতে একজন সিনিয়র মেজরের স্ত্রী ও দুই সন্তান লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা সকলকে হতভম্ব করে দিয়েছে। অবশ্য এ ধরনের ঘটনা এবারই যে প্রথম ঘটেছে তা নয়; বরং গত চার বছরে সেনাসদস্যদের লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে একটির পর একটি। এ ধরনের প্রথম ঘটনাটি ঘটে ১৯৯৬ সালের ডিসেম্বরে। সেবার ঢাকার ক্যাপ্টেন গিয়াস উদ্দীনকে পরিচয় জানার পরও দু'জন পুলিশ সার্জেন্ট শাহবাগস্থ পুলিশ কন্ট্রোল রুমে ধরে নিয়ে আসে ও দড়ি দিয়ে বেঁধে বেদম প্রহার করে। অথচ পদ বিন্যাস অনুযায়ী সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন যেখানে পুলিশ বাহিনীর সিনিয়র এএসপি পদমর্যাদাসম্পন্ন কর্মকর্তার সমান মর্যাদার অধিকারী সেখানে সার্জেন্ট পদবীর একজন কর্মকর্তা সেনাবাহিনীর কোন কমিশনপ্রাপ্ত কর্মকর্তা তো দূরের কথা একজন প্রথম শ্রেণীর কর্মকর্তাও নন। কিন্তু তারপরও সাধারণ দু'জন সার্জেন্টের হাতে শারীরিকভাবে অপদস্থ হতে হয় ক্যাপ্টেন গিয়াসকে। সে সময় এ ঘটনা সেনা প্রশাসনসহ সমগ্র প্রশাসনে ব্যাপক তোলপাড় সৃষ্টি করে। এক পর্যায়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে অভিযুক্ত দু'জন সার্জেন্টকে চাকরি থেকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হলেও পরবর্তীতে তাদের আবার পুনর্বহাল করা হয় বলে জানা যায়। এ ঘটনার অব্যবহিত পর আরিচা ফেরী ঘাটে পুলিশ সদস্যদের সাথে সেনাবাহিনীর একটি কনভয়ের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। এভাবে শুধু যে পুলিশের হাতেই সেনাসদস্যরা নিগৃহীত হয়েছেন তা নয়; বরং সরকার দলীয় ক্যাডারদের হাতেও সেনাসদস্যরা বহুবার লাঞ্ছনার শিকার হয়েছেন। এ বছরের ২৩ মে তারিখে এ ধরনের একটি অপ্রীতিকর ঘটনার শিকার হন সাভার ক্যান্টনমেন্টে কর্মরত সেনা কর্মকর্তা ক্যাপ্টেন ফিরোজ। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ছুটিতে বরিশালে বেড়াতে গিয়ে জেলা যুবগলীগ সম্পাদকরে হাতে প্রকাশ্যে প্রহৃত হন উক্ত কর্মকর্তা। নিজের পরিচয় দেয়ার পরও কেন তাকে জেলা যুবলীগ সম্পাদক অন্যান্য ক্যাডারসহ শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেন তা এক দুর্জ্ঞেয় রহস্য হলেও সরকার দলীয় রাজনীতিকের হাতে সরকারী নিরাপত্তা বাহিনীর কর্মকর্তা প্রহৃত হওয়ার ঘটনা সে সময় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এতে সেনা অফিসার ও সৈনিকদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভের সঞ্চায় হওয়ার সম্ভাবনা থাকলেও সেনা প্রশাসনের দায়িত্বশীল ভূমিকার কারণে এ নিয়ে আর কোন অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম হয়নি। এ পর্যায়ে সকলে আশা করেছিলেন সরকার দলীয় 'মাথা গরম' ক্যাডাররাও দ্বিতীয়বার এ ধরনের অনাকাংখিত ঘটনার সাথে নিজেদের জড়িত করবেন না। কিন্তু মাত্র চার মাসের ব্যবধানে ঐ একই জেলায় অর্থাৎ বরিশালে আরও একজন সেনা সদস্য শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হন ছাত্রলীগ কর্মীদের হাতে। জানা যায়, গত ২ সেপ্টেম্বর ২০০০ তারিখে বরিশালের প্রধান লঞ্চ টার্মিনালে ছাত্রলীগ কর্মীরা বেদম প্রহার করে সেনাবাহিনীর নায়েক এম চান মিয়াকে। এর ক'দিন পর গত ১৮/৯/২০০০ তারিখে চট্টগ্রামে সেনাবাহিনীর নায়েক সাইদুলকে থানায় নিয়ে প্রহার করে পুলিশ সদস্যরা।

এদিকে সম্প্রতি গত ২৬ সেপ্টেম্বর রাতে ঢাকা মহানগরীর রমনা এলাকায় পুলিশের এক নায়েকের হাতে একজন মেজর পত্নী ও তার দু'সন্তান লাঞ্ছিত হওয়ার যে ঘটনা ঘটেছে তা ইতোপূর্বেকার সকল ঘটনাকেই ছাড়িয়ে গেছে। সাধারণ এক নায়েক যে কিনা ইউনিফর্মেও ছিল না সে কিভাবে পরিচয় দেয়ার পর একজন সেনা কর্মকর্তার স্ত্রীকে অশালীন ভাষায় লাঞ্ছিত করতে পারে তা যেমন অনাকাংখিত তেমনি এ ঘটনা পুলিশ বিভাগের সার্বিক বিশৃংখল পরিস্থিতিরও ইঙ্গিত দেয়। এ ব্যাপারে অসংখ্য ক্ষুব্ধ সেনা কর্মকর্তাদের একজন জানান, যেভাবে তারা যে ধরনের আচরণ করছে সিস্টেমেটিক্যালী সেখানে তাতে এটাই মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, হয় তাদের প্রশিক্ষণ ও শৃংখলার মান অত্যন্ত নীচু অথবা তারা ইচ্ছে করেই ঘটাচ্ছে এসব ভিন্ন কোন উদ্দেশ্যে। যে কারণে বা উদ্দেশ্যেই এ ধরনের ঘটনা ঘটে থাকুক না কেন পুলিশ বাহিনী সম্পর্কে উক্ত সেনা কর্মকর্তার মন্তব্য মোটেই উড়িয়ে দেয়ার মত নয়। এক্ষেত্রে আরও একটি বিষয় বিশ্লেষকদের দৃষ্টি আকর্ষন করেছে যেখানে তারা অভিমত প্রকাশ করেছেন যে, বিচ্ছিন্নভাবে বা যে কান কারণে এ ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটার কথা তর্কের খাতিরে মেনে নিলেও এটা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এসব ক্ষেত্রে সরকারের বা সংশ্লিষ্ট বিভাগের দায়িত্ব হচ্ছে দায়ী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করে। এছাড়া এ ব্যাপারে আন্তঃ বাহিনী সম্পর্ক জোরদার করার পাশাপাশি শৃংখলা সম্পর্কিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাও করা উচিত। কিন্তু বিগত বছরগুলোও ঘটে যাওয়া ঘটনাবলীর প্রেক্ষিতে লক্ষ্য করা গেছে, সরকার এ ব্যাপারে বিশেষ কোন কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। যার ফলশ্রুতিতেই এসব অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে একটির পর একটি। যদি তাই না হত তাহলে পুলিশের একজন নায়েক এসপি'র সমান পদমর্যাদাসম্পন্ন মেজর পদবীর কর্মকর্তার স্ত্রীকে অপমান-অপদস্থ করায় কখনোই সাহস পেত না বলে সংশ্লিষ্ট মহলের অভিমত। **(দৈনিক ইনকিলাব, ৪/১০/২০০০)**

সামরিক পর্যায়ে ভারতের সাথে লেনদেন হবে স্বাধীনতা চেতনার পরিপন্থী

সেনাবাহিনীতে অশোক লেল্যান্ডের সংযুক্তি বাংলাদেশের স্বকীয় প্রতিরক্ষা নীতি ও সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করবে

আবু রুশ্‌দ॥ সকল সমালোচনা, প্রতিবাদ ও এযাবৎ বাংলাদেশের অনুসৃত স্বকীয় প্রতিরক্ষানীতি এবং কৌশলগত অবস্থানকে উপেক্ষা করে সেনাবাহিনীতে ভারতীয় অশোক লেল্যান্ড ট্রাক সংগ্রহ প্রক্রিয়া এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে সরকারের শীর্ষমহল, মিগ-২৯ স্ক্যান্ডালে জড়িত একজন বহুল আলোচিত সরকারদলীয় এমপি ও এদেশে অবস্থানকারী ভারতীয় কূটনীতিকদের অব্যাহত তদবির এবং সমন্বিত চাপ প্রয়োগের ফলে এখন যে কোন মূল্যে এ যানগুলো সংগ্রহের প্রক্রিয়া অনেকদূর এগিয়ে গেছে। সংশ্লিষ্ট একটি উচ্চ পর্যায়ের সূত্র থেকে জানা যায়, অশোক লেল্যান্ড ট্রাকের নিম্নমান, সম্ভাব্য শত্রু বিবেচনা, এমনিক দেশের প্রতিরক্ষার মৌলিক লক্ষ্যসহ সকল কিছুই ভারতের বিশেষ চ্যানেলে প্রদত্ত চাপের মুখে গৌণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। এ পর্যায়ে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ভারতীয় সমর সরঞ্জামের অনুপ্রবেশ ঘটানো যেমন এই মহলটির কাছে 'অতি গুরুত্বপূর্ণ' বা টপ প্রায়োরিটির বিষয় তেমনি এই উদ্যোগের

মাধ্যমে বাংলাদেশকে ভারতীয় প্রতিরক্ষা ডকট্রিন তথা ' এক্সটেনডেড ফ্রন্টিয়ার পলিসি'র আওতাভুক্ত করাও অন্যতম লক্ষ্য। সম্প্রতি ভারতীয় দূতাবাসের কতিপয় কূটনীতিকের 'বিশেষ ব্যস্ততা' সংশ্লিষ্ট মহলে আশঙ্কারও সৃষ্টি করেছে। এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির সদস্য ও শীর্ষস্থানীয় প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের অভিমত হচ্ছে, দক্ষিণ এশিয়ার সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনায় বাংলাদেশের একমাত্র 'সম্ভাব্য শত্রু' বা Potential Enemy হচ্ছে ভারত। কারণ, সীমান্তের তিনদিকে ভারতের অবস্থান ছাড়াও বঙ্গোপসাগরে চট্টগ্রামের দক্ষিণে অবস্থিত আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত ভারতীয় নৌ-বিমান ঘাঁটির উপস্থিতি অবশ্যম্ভাবীভাবে বাংলাদেশকে বাধ্য করেছে ভারতকে লক্ষ্য করে রণকৌশল নির্ধারণে। এছাড়া বিশ্লেষকগণ আরও মনে করেন, বাংলাদেশের সাথে ভারতের বিভিন্ন সমস্যা, আদর্শিক অবস্থানগত পার্থক্য ও ভারতীয় আধিপত্যবাধী স্ট্র্যাটেজির জন্যও আমাদের বরাবরই 'সম্ভাব্য শত্রু' হিসেবে বিবেচনা করতে হয়েছে প্রতিবেশী দেশটিকে এবং এসব লক্ষ রেখেই এ যাবত বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য নির্ধারিত হয়ে আসছে। প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞগণের মতে বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর আকার, আয়তন ছোট ও সামর্থ্য কম হলেও যে কোন ভারতীয় আক্রমণকে প্রতিহত করার লক্ষ্য নিয়েই সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনীর অবকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে এবং সে লক্ষ্যে পরিপূর্ণতা অর্জনের জন্য ধীরে হলেও এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে পূর্ববর্তী জাতীয়তাবাদী সরকারগুলো। তাই এখন যাকে লক্ষ্য করে যুদ্ধ প্রস্তুতি, তার কাছ থেকে সমর সরঞ্জাম ক্রয় হবে স্বতন্ত্র প্রতিরক্ষানীতি ও প্রতিরক্ষা অবকাঠামো ধ্বংসের নামান্তর। আপাতদৃষ্টিতে সাধারণ ট্রাক হলেও অশোক লেল্যান্ড-এর অনুপ্রবেশ হতে পারে 'সুই হয়ে ঢুকে ফাল হয়ে বের হওয়া'র মত।

এ ব্যাপারে জাতীয় সংসদের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত স্থায়ী কমিটির অন্যতম সদস্য মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান এমপি দৈনিক ইনকিলাবকে জানিয়েছেন যে, বাংলাদেশের সশস্ত্র বাহিনীকে গড়ে তোলা হয়েছে 'বন্ধু রাষ্ট্র' ভারত থেকে কোন আক্রমণ আসবে কিনা, এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে। এখন যদি ভবিষ্যতের 'সম্ভাব্য শত্রু'র কাছ থেকে সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, সমরযান ক্রয় করা হয় তাহলে তা হবে দেশের সাথে, রাষ্ট্রের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা, বেঈমানী। হবে রাষ্ট্রদ্রোহিতা এবং এটা যদি কেউ কোন স্বার্থে করে থাকে তবে আজ হোক, কাল হোক তার বিচার হবেই হবে। তিনি আরও বলেন, অশোক লেল্যান্ড-এর দাম কম হোক, কোয়ালিটি ভাল হোক তার কোনটিই বিবেচ্য বিষয় নয়। কারণ, 'সম্ভাব্য শত্রু'র কাছ থেকে এ যান ক্রয় হচ্ছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্বকে ধ্বংসের সুদূরপ্রাসারী পরিকল্পনা এবং সেই পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই আজকে তথাকথিত কম দামের অজুহাতে অশোক লেল্যান্ড ক্রয়ের তোড়জোড়া করা হচ্ছে। অথচ, এক সময় বিগত ২৪ আগস্ট ৯৯ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির ১৪ তম বৈঠকে সেনাপ্রধান অঙ্গীকার করেছিলেন, জনগণের ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কিছু কেনা হবে না। জিএসপিসি'র সভাপতি হিসেবে তিনি এবার তার সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়ন করবেন এটাই প্রত্যাশা। তবে মেজর (অব.) আখতারুজ্জামান-এর মতে, যদি সেনাপ্রধান কোন চাপের মুখে তা করতে ব্যর্থ হন তা হলে এ দেশবাসীর কাছে তিনি 'মীরজাফর' হিসেবেই চিহ্নিত হবেন।

এদিকে মান ও দর প্রসঙ্গে প্রশ্ন করা হলে তিনি অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে জানান যে, সেনাবাহিনীতে কোন সরঞ্জাম ক্রয়ের ক্ষেত্রে প্রথমে দেখা হয় কোয়ালিটি, তারপর দাম। তাই কম দামের কথা বলে অশোক লেল্যান্ড নেয়ার প্রশ্নে জনগণকে বিভ্রান্ত করা যাবে না। তবে কম দামের প্রসঙ্গটিকে যদি লাইমলাইটে নিয়ে আসা হয় তা হলে ঐ একই যুক্তিতে এক সময় বলা হবে, সমগ্র সশস্ত্রবাহিনীর খরচ কমানোর জন্য। আর ভারতের সাথে 'যুদ্ধ' করার জন্য যদি ভারত থেকেই সরঞ্জাম কিনতে হয় তা হলে প্রশ্ন আসবে, ভারত আমাদের পরীক্ষিত বন্ধু ও পর্যায়ক্রমে এমন কথাও বলা হবে যে, আমাদের আদৌ কোন সশস্ত্র বাহিনীর প্রয়োজন নেই। তাই অর্থের প্রসঙ্গ এখানে বড় হতে পারে না। ভারত যদি ক্ষুদ্র প্রতিবেশী পাকিস্তানকে লক্ষ্য করে ২৮% ভাগ প্রতিরক্ষা ব্যয় বাড়াতে পারে, তা হলে প্রতিরক্ষা খাতে অর্থ ব্যয় বাড়ানোর আমাদেরও যুক্তি থাকতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা, আমাদের দেখতে হবে আমাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী কিনা এবং যদি না হয় তা হলে কিভাবে একটি কার্যকরী সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলা যায় সেটিই হবে বিবেচ্য বিষয়। এ পর্যায়ে মিগ-২৯ এর মত অশোক লেল্যান্ড ট্রাক ক্রয়েও একই চক্রটি দুর্নীতির আশ্রয় নিচ্ছে-এ প্রসঙ্গে মতামত জানতে চাইলে তিনি বলেন, দুর্নীতি যেই করুক, তা করছে ব্যক্তিস্বার্থে। ১৭৫৭ সালে জগৎশেঠ, উমিচাঁদরাও আর্থিক লাভের আশায় নবাব সিরাজউদ্দৌলাহকে হঠানোর চক্রান্ত করেছিল। মীরজাফর ছিলেন সে ষড়যন্ত্রের মধ্যমণি। এতে নবাব সিরাজ শুধু পরাজিত হননি, পুরো ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নস্যাৎ হয়েছিল। এবার যদি বাংলাদেশে কেউ ব্যক্তিস্বার্থে ভারতেন সামরিক যান নেয়ার ওকালতি করেন, তা হলে তিনিও চিহ্নিত হবেন মীরজাফর হিসেবে। কারণ ভারতের যে কোন জিনিস বা দ্রব্য বাংলাদেশে আমদানী হতে পারে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তাতে আপত্তির কিছু নেই। কিন্তু সামরিক খাতে দু'দেশের মাঝে লেনদেন হবে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্বের বিরোধী। এক্ষেত্রে তিনি ইরাকের উদাহরণ টেনে বলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ইরাক তেল রফতানী করতে পারে, যুক্তরাষ্ট্রও ইরাকের কাছে খাদ্যদ্রব্য বিক্রি করতে পারে কিন্তু তাই বলে ইরাক কখনও স্বইচ্ছায় যুক্তরাষ্ট্রের কাছে তার কেমিক্যাল উইপন সম্পর্কে যেমন কোন তথ্য দেবে না, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রও ইরাকের কাছে কোন সমরাস্ত্র সরবরাহ করবে না। তাই তিনি আহ্বান জানান, বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে যেন কোনভাবেই অশোক লেল্যান্ড নেয়া না হয়। তাই যদি নেয়া হয় তা হলে সেই যান এ দেশে চলতে দেয়া হবে না-এই হুঁশিয়ারিও তিনি উচ্চারণ করেন।

এদিকে আলোচ্য ভারতীয় সামরিক যান নিয়ে দেশের বেশ ক'জন শীর্ষস্থানীয় প্রতিরক্ষা বিশ্লেষককের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা সকলেই একবাক্যে জানান যে, ভারত থেকে সমর সরঞ্জাম কিনে বাংলাদেশ নিজ পায়ে কুড়াল মারতে পারে না। এতে একদিকে যেমন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ধীরে ধীরে ভারত প্রভাব বিস্তার ও অনুপ্রবেশের সুযোগ পাবে, তেমনি সেনা সদস্যদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তাদের মাঝে প্রশ্ন আসবে ভারতের সরঞ্জাম নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধকৌশল নির্ধারণ করা হচ্ছে কেন? এছাড়া মান বা কোয়ালিটির প্রসঙ্গটিও হেলাফেলা করার মত নয়।

প্রতিরক্ষা বিশ্লেষকদের মতে, ফরাসী রেনল্ট বা জার্মান মার্সিডিজের বিচারে ভারতের অশোক লেল্যান্ড হচ্ছে ঘোড়ার বিপরীতে গাধার মত। মানদণ্ড বিচারের প্রসঙ্গে

এদেরই একজন মেজর জেনারেল (অব.) সুবিদ আলী ভূঁইয়ার অভিমত হচ্ছে, সেনা যানবাহনের ক্ষেত্রে একই স্ট্যান্ডার্ড বজায় রাখা উচিত। ইউরোপীয়ান স্ট্যান্ডার্ডের সাথে বিলো স্ট্যান্ডার্ড ভারতীয় টেকনোলজী সংযুক্ত করা ঠিক নয়। পাশাপাশি নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল জানান, বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পরমুহূর্ত থেকে পরাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষানীতি তথা রণকৌশলগত পর্যায়ে ভারতের সমান্তরাল পদক্ষেপ গ্রহণ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যথায় একে দীর্ঘদিন যাবৎ ভারত অনুসৃত ' এক্সটেনডেড ফ্রন্টিয়ার পলিসি'র বাস্তবায়নও বলা যায়। বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে অশোক লেল্যান্ড সরবরাহ করার মধ্যে দিয়ে এ প্রক্রিয়া আরও দৃঢ় ভিত্তি পেতে পারে। তাই যে কোন মূল্যে হোক ভারতীয় এ যান ক্রয় এখনি সময় থাকতে প্রতিহত করতে হবে যাতে তারা এ সুযোগে পরবর্তী ধাপে অপরাপর সমরাস্ত্র সরবরাহের আবদার করতে না পারে। প্রকৃতপক্ষে যত ষড়যন্ত্র, দুর্নীতি যাই হোক না কেন, অশোক লেল্যান্ডের ভাগ্যে যে এ দেশবাসীর ঘৃণাই জুটবে তা বলাই বাহুল্য। **(দৈনিক ইনকিলাব, ১২/০৩/২০০০)**

আওয়ামী নীতি আদর্শের সাথে সশস্ত্রবাহিনীকে ব্রাকেটেড করায় রাজনৈতিক অঙ্গনে তীব্র প্রতিক্রিয়া

আ'লীগকে জনগণের দেয়া ভোট সেনাবাহিনী পুলিশ বিডিআর ও চারদল চুরি করেছে

আ'লীগ ক্ষমতায় থাকতে এক কথা বলে আর বিরোধী দল গিয়ে বলে আরেক। শেখ হাসিনার এই উক্তি তাই প্রমাণ করে ঃ-

আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা আগামী ১০ তারিখে অবরোধ কর্মসূচী সফল করার জন্য কর্মীদের আহ্বন জানান এবং এরপর সারা বাংলাদেশ সফর শেষে অসহযোগ আন্দোলন গড়ে তোলা হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন। গতকাল দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত মহানগরীর বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠন ও সহযোগী সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সাথে এক বৈঠকে তিনি এই ঘোষণা দেন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে শেখ হাসিনা বলেন, আওয়ামী লীগের নিশ্চিত বিজয়কে ষড়যন্ত্র করে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। দেশের জনগণ আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে কিন্তু সেনাবাহিনী, পুলিশ, বিডিআর , প্রশাসন ও চার দল জনগণের ভোটকে চুরি করেছে। **(দৈনিক ইনকিলাব, ০৮/১০/২০০১)**

আবু রুশ্‌দ